শান্তা নাগ

পূর্বস্মৃতি

প্যাপিরাস
২ গণেন্দ্র মিত্র লেন
কলিকাতা ৭০০ ০০৪

প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১০৬০

স্বত্ব : শ্রীমতী শান্তা নাগ

প্রচ্ছদ : দেবব্রত ঘোষ

প্রকাশক : অরিজিৎ কুমার

প্যাপিরাস

২ গণেন্দ্র মিত্র লেন

কলকাতা ৪

মুদ্রক : ধীরেন্দ্রনাথ বাগ

নিউ নিরালা প্রেস

৪ কৈলাস মুখার্জী লেন

কলকাতা ৬

জেলদ্গর জলিলুদ্দীন অ্যাণ্ড কোং

১৬৬ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট

কলকাতা ৯

পূর্বস্মৃতি

কোন এক মহাপুরুষের কথা শুনেছিলাম যে তিনি মাতৃক্রোড়ে স্তন্যপান করছেন, তা-ও তাঁর মনে পড়ে । আমি সামান্য লোক হলেও আমার অনেক সময় মনে হয়, আমি যখন ছোট শিশু—মায়ের কোলে শুয়ে দুধ খাই, তারপর একটু একটু করে বড় হয়ে আর পাঁচটা মানুষের মত হতে থাকি, তখন আমি কী ভাবতাম, কী করতাম, এগুলো সব কেন আমার মনে পড়ে না ? এটা একটা বড় দুঃখ । 'শিশু আমিটা কী-রকম ছিলাম' জানতে অনেকেরই ইচ্ছা হয় ।

মনে যখন নেই তখন পরের মুখে শোনা কথা জেনেই খুশি থাকা ভাল । শুনেছি আমি ছোট্টবেলায় খুব মোটাসোটা ছিলাম, দৌড়তে পারতাম না । তাই আমার সুন্দর ছোট্ট দাদাটি যখন দৌড়ে বেড়াতেন, তখন আমি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে হাত-পা নেড়ে নেড়ে বলতাম, "দোলা দুলি, দোলা দুলি ।" দাদা আমার চেয়ে দেড় বছরের বড় । মস্ত দাদা তাঁর ছোট বোনটিকে বলতেন, 'ভাইটি' । যদি কেউ জিজ্ঞাসা করত, "তোমার ভাইটি কত বড় ?" দাদা বলতেন, "আকাশ পন্‌যত ।"

আমার দাদা দেখতে খুব সুন্দর ছিলেন । তাঁর শিশুকালে প্যারিসে একটা শিশু-প্রদর্শনী হচ্ছিল । পাড়ার লোকেরা বাবাকে বলতেন, "আপনার খোকাকে Paris exhibition-এ পাঠিয়ে দিন !" পাঠিয়ে দেওয়া হয়নি অবশ্য । সুন্দর ছেলের জন্য মায়ের গর্ব হলেও কিন্তু ছবি তুলে রাখেননি । এমনকি ছয়-সাত বৎসর বয়সের আগের দাদার কোন ছবিও দেখিনি ।

আমি কিন্তু মোটেই দাদার মত দেখতে হইনি । তাঁর নিখুঁত মুখ নাক চোখ কোনটাই আমি পাইনি । মা বলতেন, "ছোট্ট বয়সে পোড়া নারাঙ্গা হয়ে তোমার রংটা ময়লা হয়ে গেল ।" যাক গে, তাতে কিছু এসে যায় না । ছোট বয়সে ওসব নিয়ে কখনও মাথা ঘামাইনি । আমার বোন সীতা আমার চেয়ে প্রায় দু-বছরের ছোট । তিনটি শিশু নিয়ে আমার একুশ বছরের ছোট্ট মা বড় বিব্রত থাকতেন । তাই আমার এক মাসিমা আমাকে পালন করবার ভার নিলেন, মাসিমা আমাকে অদ্ভুত ভালবাসতেন । কিন্তু তাঁর ভালবাসা প্রকাশের ধরনটা বিচিত্র ছিল । তিনি আমায় কোলে নিয়ে আদর করে বলতেন, "টিপ-কপালী, থ্যাবড়া নাকী ।" আমার দুটো গালের চাপে নাক বেচারা তার উচ্চতা সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছিল । মাসিমার

ছোট ছেলের নাম জীবন। সে তার মাকে ভারি ভালবাসত। মাতৃস্নেহের একজন ভাগীদার জোটাতে তার মনে বড়ই আঘাত লেগেছিল। সে বলত, "কোত্থেকে একটা ঢেপসি মেয়ে এসে আমার মা-টাকে কেড়ে নিল।" রাগ করে জীবনদাদা একদিন আমার নাক টিপে ধরেছিল। কারুর চোখে না পড়লে সেইদিনই হয়ত আমার ভব-লীলা সাঙ্গ হয়ে যেত। কিন্তু ওর হিংসাটা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। পরে সে আমাকে খুবই ভালবাসত।

আমার ছোট বোনটির জন্মসংবাদ পেয়ে আমার মেজজ্যাঠা মহাশয় বাবাকে লিখলেন, "তোমার আর একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করাতে বড় দুঃখিত হইলাম।" বাবা ভীষণ চটে গেলেন, বল্লেন, "মেজদাদাকে কি আমার মেয়েকে খাওয়াতে হবে যে তিনি দুঃখিত হতে গেলেন?"

সীতাও দেখতে সুন্দর হয়েছিল। তাকে লোকে হাঁসের ডিমের মত সাদা বললে সীতা বলত, "হাঁতান দিম।" বাবা বলতেন, "সীতা আমার মায়ের মত দেখতে হবে।" হয়ত সে ঠাকুরমার মত দেখতে হয়েছিল, কিন্তু তাঁর মত নিরীহ ভালমানুষ হয়নি। সুন্দর দেখে তাকে পাড়ার মেমসাহেবরা আদর করে কাছে ডাকলে সে অর্ধেক বাংলা ও অর্ধেক হিন্দী মিশিয়ে বলত, "যাব না রে লক্ষ্মীছাড়ী পক্ষীছাড়ী। সাহেবলোগ কৌয়া খাতা হ্যায়, ওলোগ পেতেনী হ্যায়।"

প্রথম স্মৃতির কথা লিখব মনে করে নিজের স্মৃতিতে যেসব কথা ধরে রাখতে পারিনি তাই আগে লিখে বসলাম।

যতদূর মনে পড়ে আমার প্রথম স্মৃতি অতি সাধারণ একটা জিনিস। এলাহাবাদে বোধহয় আমি আড়াই কি দুই বৎসর বয়সে মা-বাবার সঙ্গে যাই, সেখানে যে বাড়ীতে প্রথম ছিলাম হয়ত তারই একটুকরো আমার প্রথম স্মৃতি। বাড়ীতে একটা বারান্দা ছিল এবং একটা অত্যন্ত উঁচু চটের পরদা গলির মুখের আবরু রক্ষা করত। হয় আমি বাহিরের জগৎটা দেখতে উৎসুক ছিলাম, অথবা কুৎসিত পরদাটা আমার চক্ষুশূল ছিল। তাই সেই স্মৃতিটাই আমার মনে আজও জেগে আছে, সেই সময়ের এলাহাবাদের চেহারাটা কিচ্ছু মনে নেই। বোধহয় বিশেষ বেরোতে পেতাম না। মা শিশুদঙ্গল নিয়ে বিব্রত থাকতেন। ছোটবেলা মায়ের আদর পেয়েছিলাম, কিন্তু সীতার আগমনের পর মা তাকে নিয়েই এত ব্যস্ত থাকতেন যে মায়ের আদর কাকে বলে তা আমার মনে পড়ে না। সীতার হজম ভাল হত না বলে সে নাকি সারারাত কাঁদত এবং সকালে উঠে চাকরের মেয়ের নামে দোষটা দিয়ে বলত, "ঘিসিয়া কাঁদে —ওমা, হ্যাঁ।" যদিও মাসিমা কিছুদিন পর্যন্ত আমায় পালন করেছিলেন, তবু মোটা-

মুটি আমি ছিলাম স্বাধীন জেনানা। আমাকে কেউ খাইয়ে দিচ্ছে কি স্নান করাচ্ছে এসব মনেই নেই। নিজেই নিজের সব করতাম এবং বোধহয় এইজন্যেই আমি কারুর সঙ্গে শুতে ভালবাসতাম না। শীতের রাতে ঘুম পেলে জুতো, মোজা, ফ্রক, ওভার-কোট সব পরে শুয়ে পড়তাম। কেউ বারণ করলেও শুনতাম না। তাছাড়া আমি ছিলাম ভীষণ শীতকাতুরে। অনেক রাতে মা আমার বুটজোড়া ও ওভারকোটটা খুলে নিতেন। তখন আমি ঘুমে অচৈতন্য। এলাহাবাদে কন্‌কনে শীত পড়ত। সাহেববাড়ীতে চিমনি থাকত আগুন পোয়াবার জন্য। আমাদের ছিল না। আমি নিতান্ত স্থানাভাব না হলে একলাই শুতাম। কাজেই জুতো মোজা পরে শুয়ে পড়লে কারুর অসুবিধা হত না। সকালে যখন আমার বিছানা তোলা হত তখন দেখা যেত পাথরবাটি ভাঙা অনেকগুলো টুকরো বালিশের তলায় সুরক্ষিত রয়েছে। পাথর-বাটির টুকরো দিয়ে মেঝে বা স্লেটের উপর বেশ লেখা যেত। আমরা ভাইবোনেরা সেগুলি ভাগ করে নিজের নিজের অংশ নিজের কাছে রাখতাম। আমি বোধহয় বেশী সাবধান ছিলাম তাই বালিশের তলায় নিজের ধন-দৌলত রাখতাম। এলাহা-বাদে খুব পাথরবাটি বিক্রী হত। এসব কথা কিছু পরের। এর আগে যে কথাটি আমার সবচেয়ে পরিষ্কার মনে আছে সেটি আমার সাড়ে তিন বৎসরের একটি বেদনাময় স্মৃতি। আজও স্পষ্ট মনে পড়ে আমাদের শোবার ঘরের মেঝেতে আমার সুন্দরী তরুণী হাস্যমুখী মা তাঁর রাশীকৃত চুল ধুলায় লুটিয়ে উপুড় হয়ে পড়ে নিঃশব্দে কাঁদছেন। পাশের শুভ্র বেশধারী এক সুদর্শন পাঞ্জাবী ভদ্রলোক ও একটি বয়স্কা বিধবা বাঙালী মহিলা কী সব নাড়াচাড়া করছেন। তাঁরা একটি ছোট খাটের দু-ধারে দু-জন। সেই খাটে একটি ফুলের মত শিশু চোখ বুজে শুয়ে আছে। পরে জেনেছিলাম সে আমাদের ভাই দেবব্রত। এক মাস বয়সেই ইরিসিপেলাস রোগে তার মৃত্যু হয়। পাঞ্জাবী ব্রাহ্ম সুন্দরসিংজী ও শ্রীযুক্তা চঞ্চলা ঘোষ তার সেবা করতে এসেছিলেন।

এই বাড়ীটা ছিল এলাহাবাদের সাউথ রোডে। বাড়ীর মালিক ছিলেন ব্যারি-স্টার রৌশনলাল। এখান থেকে বাবার কলেজ কায়স্থ পাঠশালা খুব কাছে ছিল। সেকালে ব্রাহ্মসমাজে একের দুঃখে বিপদে অপরে আত্মীয়ের মত সাহায্য করতেন। তাই বাবার এই বিপদের সময় বন্ধুরা সাহায্য করতে দূর থেকে এসেছিলেন। তখন-কার দিনে মানুষের বাড়ীতে স্থানাভাব নামক কথাটার চলন হয়নি। অল্প ভাড়াতেই অনাবশ্যকরকম বেশী স্থান পাওয়া যেত। আত্মীয়বন্ধুর জন্য বাড়ীর দুয়ার থাকত অবারিত।

মনে পড়ে তারপর বহুদিন দুপুরবেলা যখন বাবা কলেজে থাকতেন তখন মা বাক্স থেকে একটি ছোট পুঁটুলি বার করে চেয়ে চেয়ে দেখতেন। তাতে ছিল গুটি-কয়েক রঙিন ডোরা-কাটা জামা, প্রায় পুতুলের গায়ের মাপের মত। খানিক পরে মা আবার সেগুলি গুছিয়ে তুলে রাখতেন।

এরপর এল একটি আনন্দের দিন। মাঘী পূর্ণিমার রাত্রি আকাশভরা জ্যোৎস্নার মধ্যে বাড়ীতে একটা ব্যস্ততা দেখা দিল। কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না, ভোরবেলায় জেগে উঠে শুনলাম আমাদের একটি নূতন ভাই এসেছে। ছুটে গেলাম তার ঘরে। দেখি সুন্দরী মায়ের বিছানা আলো করে মাঘী পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার মত সুন্দর একটি শিশু শুয়ে আছে। সকলের মুখে হাসি আর ধরে না। বাবা বলেন, আমরা নাকি দুই বোনে দুটো ইঁট হাতে করে শিশুর দরজার দু-পাশে দাঁড়িয়ে গেলাম। কার কাছে শুনেছিলাম গত বছর কে যেন আমাদের ভাইকে নিয়ে চলে গিয়েছিল, সে আর আসেনি। এবার তাই ঠিক করলাম যে আসবে তাকে আমরা দুই বোনে ইঁট মেরে সায়েস্তা করে দেব। তখন আমার বয়স সাড়ে চার, আর সীতার বয়স আড়াই পার হয়ে গেছে। আমার ঠাকুরমা নূতন শিশুটিকে এক মুঠো ক্ষুদের বদলে বেচে দিলেন। তাহলে আর শিশুর উপর কোন অমঙ্গলের দৃষ্টি পড়বে না। শিশুটির ডাক নাম হল ক্ষুদু। বাবা তাঁর শোকে সান্ত্বনারূপে ওর নাম রাখলেন ‘অশোক’। বেশ কয়েক বৎসর পর্যন্ত আমরা ছিলাম এই চার ভাই বোন।

এই বাড়ীতে মাকে দেখতে আসতেন ফুলমণি নামে এক খ্রীষ্টান ধাত্রী। তিনি বাঙালী এবং বেশ ভাল বাঙলা বলতেন। কিন্তু তাঁর পোশাক ছিল মেমসাহেবের মত। গোড়ালী পর্যন্ত লম্বা স্কার্ট ও ব্লাউজ। মাথায় একটা ফ্যাশানেব্‌ল্‌ টুপিও ছিল। ফুলমণির স্বামী ছিলেন কুটকুটে কালো। কিন্তু নিজেকে তিনি সাহেব মনে করতেন। মায়ের একজন কালো নার্সও ছিলেন, সে-ও মেমসাহেবের মত ফ্রক পরত। সাউথ রোডের বাড়ীটায় আমরা বছর পাঁচেক ছিলাম। এলাহাবাদ যদিও সমতল জায়গা, তবু এই বাড়ীটার রাস্তাটা বড় রাস্তা থেকে ঢালু হয়ে নেমেছিল যেন পাহাড়ের গা। একদিকে মেহেদির বেড়া। একটা বড় ঘাসের লন, তার পাশে খোদ রৌশনলাল সাহেবের বাড়ী এবং পিছন দিকে আরও দুটি ছোট ছোট বাড়ী। সব-চেয়ে শেষে মস্ত একটা পেয়ারা বাগান। ফলের সময় পাকা পেয়ারার মিষ্ট গন্ধে বাগান ভরে থাকত। পেয়ারা বাগানের পাশে বা পিছনে স্টেশন রোড বলে একটা রাস্তা ছিল। আমি সে রাস্তাটা বেশ বড় হবার আগে কখনও দেখিনি কিন্তু প্রত্যহ দেখতাম সন্ধ্যার আগে সারা আকাশ লাল করে সূর্যদেব স্টেশন রোডের পিছনে

কোথায় যেন টুপ করে ডুবে যান। আমি ছোটবেলায় ভাবতাম ওখানে নিশ্চয় একটা অতল গহ্বর আছে। কিন্তু কাছে গিয়ে দেখবার সাহস হত না।

এলাহাবাদের অনেক বাড়ীর বারান্দা ও কার্নিশ পাথরের হত। আমাদের পাশে একটা উঁচু জমিতে অনেকগুলো দু-হাত আড়াই হাত পাথর পড়ে থাকত। লোকে বলত, "ওটা ঠিকাদারের জায়গা।" ঠিকাদার কাকে বলে তখন জানতাম না, ভাবতাম না জানি কী একটা তাজ্জব মানুষ সে। এত পাথর দিয়ে সে কী করে, কল্পনাই করতে পারতাম না।

ক্ষুদুর যখন মাস চারেক বয়স তার একটু আগেই আমার পাঁচ বৎসর পুরে গেছে। আমি শোবার ঘরের মেঝেতে কোল পেতে বসে ক্ষুদুকে কোলে নিয়ে খেলা করতাম। ওকে নিয়ে দাঁড়িয়ে উঠতে পারতাম না। ক্ষুদুর একটা ঝি ছিল তার নাম সুমারিয়া। এক কানে মস্ত একটা রূপার ফুল বড় একটা সিলভার মেডেলের সমান। তবে তার মাঝখানটা উঁচু আর তার থেকে রূপার জিঁজির ঝুলত। অন্য কানে ফুল ছিল না। তাই সে দুঃখ করে বলত, "কা করি—হামার দুইঠো তড়কী নহি হ্যায়।" বেচারী একটাতেই সন্তুষ্ট ছিল। সুমারিয়া সুবিধে পেলেই ক্ষুদুকে আমার কোলে দিয়ে একটু ঘুমিয়ে নিত। ক্ষুদু বেশ ফর্সা গাঁট্টাগোঁট্টা দেখতে হয়েছিল। চাঁদের মত গোল মুখ, পাতলা পাতলা লাল ঠোঁট আর নরম কিন্তু সোজা সোজা একমাথা চুল। নরম নরম সুডৌল হাত পা, কিন্তু কথাগুলো একেবারেই নরম ছিল না। সে খুব ছোট বয়সেই কথা বলতে শিখেছিল। তার বেশীর ভাগই হিন্দি। কিন্তু কথাগুলো উচ্চারণ করত শক্ত শক্ত করে। কর্নেলগঞ্জকে সে বলত 'কণ্ডেলগঞ্জ' 'দরওজা বন্ধ কর' বলতে বলত 'দরওয়াজা পণ্ড্রা কর'। নিজের বুদ্ধির ওপর তার তখনই অসীম শ্রদ্ধা। যখন বছর দুই কি আড়াই বয়স তখন একদিন এক মেছুনী মাছ বিক্রী করতে এসেছিল। তার মাছগুলো ছোট ছোট চুনো মাছ। ক্ষুদু ছুটে এসে বলল, "আরে, এ মছলি কৌন পেঁড়মে ফরতা হ্যায়?" মেছুনী হেসে বলল, "ক্যা বাবু, মছলী পেঁড়মে ফরতা হ্যায় কি পানিমে?" ক্ষুদু কিছুমাত্র না দমে বলল, "আরে পানিই মছলিকা পেঁড় হ্যায়।" আর একদিন মায়ের একটা মালিশের শিশি মা একটা উঁচু তাকে তুলে রাখছিলেন; আমাদের বললেন, "ওটা যেন ছুঁয়ো না, এ বিষ, খেলে মানুষ মরে যায়।" ঘণ্টা দুয়েক পরে ক্ষুদু এসে মায়ের কাছে সদর্পে বলতে লাগল, "আমি কিছুতেই মরি না, বিষ খেলেও মরি না।" মা ভয়ে ছুটে এসে দেখেন, তাকের উপর মালিশের শিশিটা যথাস্থানেই রয়েছে এবং ক্ষুদুর গায়ে ভুর ভুর করছে

গোলাপ জলের গন্ধ। মালিশের শিশির পাশেই ছিল একটা গোলাপ জলের শিশি, সেটা খালি পড়ে আছে।

মায়ের দুইজন মেমসাহেব শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। একজন মিশনারী মেম, তিনি ইংরেজী পড়াতেন, অন্যজন মিস্ ল্যাংলী বলে এক ফিরিঙ্গি মহিলা। মিস্ ল্যাংলীরা ষোলটি ভাই-বোন, আমাদের বাড়ীর কাছেই থাকতেন। মিস্ ল্যাংলী বোধহয় মাকে ডাকতেন বৌ বলে। তাঁর চুল কম ছিল এবং আমার মায়ের চুল ছিল হাঁটু পর্যন্ত, ভ্রমরকৃষ্ণ কুন্তল। মিস্ ল্যাংলী বলতেন, "বউ তোমার এত চুল কী করে হল? তুমি কী তেল মাখ?" মা বলতেন, "আমি নারকেল তেল মাখি।" মেমসাহেব কয়েকদিন পরে এসে বললেন, "বউ আমি ত রাত্রে শোবার সময় নারকেল তেল মেখেছি, কিন্তু আমার চুল একটুও বড় হল না। তার উপর আবার মাথায় পিঁপড়ে ধরে যায়।" মেমসাহেব বোধহয় মাথায় এক শিশি পুরো তেল ঢেলেই শুতেন। রাত্রে বোধকরি ঘুমও হয়নি। ইনি মাকে হার্মোনিয়ম বাজাতে শেখাতেন। মা অতি দ্রুত সব শিখে নিতেন।

মায়ের কথা বলতে হলে কত কথাই মনে হয়। তিনি অতি সাদাসিধা পোশাক পরতেন, কিন্তু তাঁর স্বাভাবিক সৌন্দর্য ও মিষ্ট হাসিই ছিল তাঁর শ্রেষ্ঠ ভূষণ। মাকে আমি কখনও বিনুনি করে কাঁটা দিয়ে খোঁপা বাঁধতে দেখিনি। তিনি তাঁর রাশিকৃত চুল টান করে বেঁধে হাতে প্যাঁচ দিয়ে একটি খোঁপা করে রাখতেন। অনেক ফিতের গুছি কাঁটা দিয়েও লোকে অত বড় খোঁপা সহজে বাঁধতে পারত না। বাবা চির-কালই স্বদেশী শিল্পের উপর নির্ভর করতে ভালবাসতেন বলে মা সর্বদা দেশী মিলের কাপড় পরতেন। ধোপার বাড়ী দিলেই তার পাড়ের রং চারধারে ছড়িয়ে পড়ত। ছেলেবেলার স্মৃতিতে মায়ের পোশাকি শাড়ী বলতে দু-খানা কাপড় কেবল মনে পড়ে—একটা আসমানি রংয়ের পার্শী শাড়ী আর একটা বেগুনী রংয়ের মেরিনো (গরম) শাড়ী। আমার দাদামশায় মাকে একবার একটা চন্দ্রকোণার চৌখুপী শাড়ী দিয়েছিলেন। সেই শাড়ীটা পরিয়ে মায়ের একটা ফোটোগ্রাফ বাবা তুলেছিলেন। বাবা খুব ভাল ছবি তুলতেন। মায়ের ভাল ছবি বলতে ঐ ছবিটিই আমাদের সম্বল। তখন অনেক তাঁতের শাড়ীর তিনটে পাড় থাকত, নামটা পাছাপাড়। মার শাড়ী-টারও তিনটে পাড় ছিল।

যদিও অল্প বয়সেই মাকে পুত্রশোক পেতে হয়েছিল তবু পারিবারিক জীবনে মা ছিলেন সুখী ও তৃপ্ত। আজকাল মেয়েদের এরকম তৃপ্ত দেখা যায় কম। নিজের মনে গান করায় ছিল তাঁর আনন্দ। মার গানের গলা ছিল অপূর্ব। একলা গেয়েই একটা

হল ভরিয়ে দিতে পারতেন। আমরা বাঙলার বাইরে মানুষ হয়েছিলাম। কিন্তু মায়ের দৌলতে আমরা শিশুকাল থেকেই অনেক বাঙলা গান শিখেছিলাম। শুধু যে রবীন্দ্র-সঙ্গীত তা নয়; যাত্রার গান, ভাদু পূজার গান, আগমনীগান সবই মা গাইতেন। মনে পড়ে মায়ের মধুর গলায় সাঁওতালী গান:

"বাবুদের কলা বাগানে
ওলো, আমার গোলাপকাঁটা
ফুটেছিল চরণে।"

নয়ত ভাদুর গান:

"কাশীপুরের রাজার মেয়ে
ছিলে তুমি নন্দিনী,
জয় ভাদুমণি।"

যাত্রার গানে ভীষ্মের শরশয্যার গান ছিল মার প্রিয়:

"মরিরে বাপ কুমার আমার।
এদশা তোর কে করিল?
জানিরে তোর ইচ্ছামরণ
শরশয্যা কিসের কারণ
বিশ্বমাঝে কোন পাষণ্ড
ভীষ্মজননী নাম ঘুচাল?"

আজকালকার দিনে গল্প বলা আর শোনার রেওয়াজ উঠেই গিয়েছে। মা গল্প বলতেন আর্টিস্টের মত। আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনতাম। আমার সবচেয়ে ছোট ভাই মুলু প্রতিরাত্রে ঘুমোবার সময় গল্প শুনতে চাইত। তার কয়েকটা ফেভারিট গল্প ছিল। তার মধ্যে একটা হল সুখুদুখুর গল্প। মা যদি গল্প বলতে বলতে কোনও যায়গাটা একটু বদলে ফেলতেন, মুলু তৎক্ষণাৎ সংশোধন করে দিত। আমার পছন্দ ছিল অমূল্যরতন শাড়ী আর সাত বৌয়ের গল্প। শাশুড়ী সাত বৌকে খেতে দিচ্ছেন আর বলছেন:

"সাত বৌয়ের সাত আসকে খড়কের আগায় ঘি
খুঁৎ খুঁৎ খুঁৎ করছ কেন খেতে লারছ কি?
দাও দাও ঢেকে রেখে দি'।"

বর্ষায় যখন কাল মেঘে আকাশ ঢেকে আসত, বৃষ্টি যেন নামে নামে, তখন পাড়ায় পাড়ায় বড় বড় নিম গাছের ডালে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তক্তা দড়িতে ঝুলিয়ে দোলনা

টাঙানো হত। হিন্দুস্থানী মেয়েরা সারি সারি দোলনায় ঘোমটাসুদ্ধ বসত আর ছেলেরা দোলনার উপরেই দু-পাশে দাঁড়িয়ে দোল দিত। ঝরঝর বারিধারার মধ্যেও মেয়েদের মিলিত কণ্ঠের গান শোনা যেত,

"আরে রামা, সাঁঝ ভেল
ঘরে নাহি আইসে কানাহিয়া
হে হরি···।"

আমরা বৃষ্টিতে দোল খেতাম না বটে, তবে মায়ের সঙ্গে সঙ্গে ঐসব ঝুলনের গান-গুলি গাইতাম। রবীন্দ্রনাথের 'কালমৃগয়া'র গান মা আমাদের শেখাতেন, "ও ভাই দেখে যা কত ফুল ফুটেছে।"

মা বেশ ভাল হিন্দি বলতেন—গাঁইয়া হিন্দি বা দেহাতী বুলি নয়—চোস্ত্ হিন্দি। পড়তেও শিখেছিলেন। 'সরস্বতী' নামে একটা হিন্দি মাসিকপত্র ছিল, মা সেটা নিয়মিতই পড়তেন। এইসময়ে মাসীমার বড়ছেলে প্রতিভারঞ্জন একজন মৌলবীর কাছে উর্দু পড়তেন, তার দেখাদেখি মা-ও উর্দু পড়তে শেখেন। অক্ষরগুলো আমরা চিনতাম না কিন্তু আলিফ বে পে তে বলে যেতাম গড় গড় করে। মৌলবী সাহেব একটু পড়িয়েই ঢুলতে থাকতেন, তারপর জেগে উঠে বলতেন, "বহুৎ পড় লিয়া বাচ্ছা।"

আমি নিজের সাজপোষাক স্নানাদি যেমন নিজেই করতাম, বিদ্যা অর্জনও তেমনি নিজেই সুরু করি। মা বলতেন, "একদিন দেখলাম শান্তা 'সঞ্জীবনী' পড়ছে। অবাক হয়ে বললাম, 'তুই পড়তে শিখলি কি করে?' শান্তা বললে, 'কেন তুমি যে দাদাকে পড়াও।'"

মা দাদাকে প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ পড়াতেন, আমি টেবিলের উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে থাকতাম।—কেউ অত লক্ষ করত না।—কিন্তু আমি ঐরকম করেই বাঙলা পড়তে শিখে নিয়েছিলাম। কিন্তু একটা মজা ছিল তার মধ্যে। আমি বই পড়তাম উল্টো করে। জীবনদাদা ও মাসীমা অনেক চেষ্টা করেও আমাকে সোজা-দিকে বই ধরাতে পারতেন না। কিছুকাল পরে আমাদের জন্য এক বৃদ্ধ বাঙালী মাস্টারমশায়কে রাখা হয়েছিল। তিনি যে আমাদের কী পড়িয়েছিলেন অনেক চেষ্টা করেও মনে আনতে পারি না। কিন্তু মনে আছে, আরও কিছু কাল পরে এক বাঙালী যুবক আমাদের পড়াতে এলেন। তিনি অঙ্ক কষতে খুব ভালবাসতেন, আমিও অঙ্ক ভালবাসতাম। মাস্টারমশায় আমাকে মাত্র আট বৎসর বয়সে সারা পাটিগণিতটাই প্রায় শেষ করিয়ে দিলেন। বড় বড় square root-এর অঙ্ক কষতাম মনে আছে। কী কারণে জানি না তিনি বদলী হয়ে গেলেন।

এবং ঠিক তার পরেই আমার দাদা, সীতা আর ক্ষুদ্র তিনজনে টাইফয়েড বাধিয়ে বসলেন। আমার ত পড়াশুনা মাথায় উঠে গেল।—আমি ছেলেবেলায় খুব সুস্থ ছিলাম, কখনই আমার জরজারি হত না। কিছুদিন পরে মায়ের আবার চোখ উঠল এবং আমাদের পাচক মহারাজ (ওদেশে রাঁধুনী ব্রাহ্মণকে মহারাজ বলে) 'ক্ষেতি-বারি' করতে দেশে চলে গেলেন। বাবা পড়লেন মহা মুশকিলে। কলেজ আছে, 'প্রবাসী' কাগজ আছে, তার ওপর বাড়ীর এই অবস্থা। অগত্যা আমাকেই আট বৎসর বয়সে রন্ধনের ভার নিতে হল। আমি হাঁড়ি নামাতে পারতাম না। ভাত ফুটে উঠলেই বাবার বসবার ঘরে দৌড়ে গিয়ে বলতাম, "ও বাবা, মাড় পশিয়ে দাও" (অর্থাৎ ফেন গেলে দাও); বাবা ফেন গেলে দিয়ে যেতেন। রুটির তাওয়া নামাতে পারতাম না বলে রুটিগুলো যতক্ষণ না ফুলে ঢোল হত ততক্ষণ তাওয়াতেই ওলোট-পালোট করতাম। এদিকে আমার সন্তরোগমুক্ত তিন ভাইবোন হাঁটতে ভুলে গিয়েছিলেন। খাবার সময় তাঁদের আমি বিছানা থেকে কোলে করে তুলে আনতাম, দাদাও বাদ যেতেন না। ক্ষুদ্রর বয়স সকলের কম, কিন্তু সে সবার আগে হাঁটতে শিখল ক্রমে ক্রমে।

যাই হোক, দু-দিন বাদেই আবার পড়াশোনা সুরু হল। দেখা গেল, আমি যেমন দ্রুত সমস্ত পাটিগণিত শিখে ফেলেছিলাম, তেমনি দ্রুত সব ভুলে গিয়েছি। যাক্, আবার শিখে নিতে খুব দেরী হল না।

শিশুকাল থেকে সাউথ রোডের বাড়ীটাকেই নিজেদের বাড়ী বলে জানতাম। কিন্তু ডাক্তাররা বললেন, "এ বাড়ীতে আর থাকা চলবে না। অন্য ভাল বাড়ীতে বাচ্ছাদের সরাতে হবে।" খোঁজ খোঁজ করে বিরাট এলফ্রেড পার্কের পাশে খাস সাহেবপাড়ায় একটা বাড়ী নেওয়া হল। তার লাল দেওয়াল ঘেরা প্রকাণ্ড বড় আম বাগান। একেবারে বড় রাস্তার ওপরে পার্কের উল্টোদিকেই গেট। সকালে-বিকেলে সেখান দিয়ে শ্বেতাঙ্গ শিশুরা আয়াদের সঙ্গে বাগানে বেড়াতে যেত। সীতা মুগ্ধ হয়ে তাদের দেখতে দেখতে খেতেই ভুলে যেত। মা বলতেন, "কী করছিলি এত-ক্ষণ?" সীতা বলত, "মেমের মেয়ে দেখছিলাম।" পার্কে একটা band stand ছিল। সেখানে band শুনতে আমরা প্রায় যেতাম। তারপর পার্কের বড় বড় লাল ফুলের গাছগুলো এখনও মনে পড়ে।—আমার ভাইবোনদের পাল্কিতে শুইয়ে নূতন বাড়ীতে আনা হয়েছিল। এ বাড়ীতে এসে তারা চট্‌পট্ খাড়া হয়ে উঠল। দাদা ত আম গাছের মাথায় চড়ে বসে থাকতেন, আমরা নীচে ছুটোপাটি করতাম। একদিন এক ভদ্রলোক বাবার সন্ধানে এসে বাবাকে না পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "বাড়ীতে আর

কে আছে ? আমি বললাম দাদা আছে।" ভদ্রলোক বললেন, "দাদাকে ডাক।" তিনি ভেবেছিলেন দাদা মাতব্বর মানুষ। দাদা যে আমার চেয়ে দেড় বৎসরের বড় এবং তখন আম গাছের উপর চড়ে আকাশকুসুম দেখছেন তা ত তিনি জানতেন না। আমি অপ্রস্তুত হয়ে বললাম, "দাদা ত গাছে চড়ে বসে আছে।" ভদ্রলোক হতাশ হয়ে চলে গেলেন।

রৌশনলালের যে বাংলো আমরা ছেড়ে এলাম তার কাছেই বড় একটা বাড়ীতে তিনি থাকতেন, আগেই বলেছি। এঁর স্ত্রী লাহোরের ব্রাহ্ম পরিবারের কন্যা। এঁর শ্যালকের জামাতা হন সচ্চিদানন্দ সিংহ ('হিন্দুস্থান রিভিয়ু'র সম্পাদক)। রৌশন-লালের একটি পালিত পুত্র ছিল। সে খুব মেম-ভক্ত ছিল। বলত, "হম্ বিলাইতসে বোরামে বৈঠাকে মেমসহাব লেয়ায়েঙ্গে।" কিছুদিন পরে গৃহকর্তা বাড়ীটা তেজ-বাহাদুর সাপ্রুকে ভাড়া দিয়ে দেন। তখনও আমরা ওখানেই থাকতাম। তেজ-বাহাদুরের বিরাট পরিবার। তাঁর মা, বাবা, ঠাকুরদা, স্ত্রী, কন্যা সবাই ওখানে থাকতেন। সত্যি কিনা জানি না, শুনতাম ওঁর স্ত্রীর নাম তেজরানী ও কন্যার নাম তেজদুলারী ছিল। ঐটা বোধহয় পারিবারিক প্রথা। তেজবাহাদুরের ঠাকুরদাদাকে আমার এখনও মনে পড়ে। সুবেশ ছোট্টখাট্ট ফর্সা শান্ত মানুষটি, সকালে-বিকালে ফুলবাগানে পায়চারি করতেন। কিন্তু তেজবাহাদুরের বাবা ছিলেন মস্ত মোটা, সারাদিনই চেয়ারে বসে থাকতেন আর কথায় কথায় সজোরে চীৎকার করতেন। তাঁর প্রাত্যহিক একটা কাজ ছিল চাকরকে সকালে বাজার করতে দেওয়া। তিনি উচ্চৈঃস্বরে চেঁচিয়ে বলতেন, "এক সের গাজর, আধ সের করেলা, দুই আনাকো পান" ইত্যাদি। ক্ষুদু তার নকল করে বলত, "এক সের গোজর···" ; গোজর মানে বিছে। ভদ্রলোকের একটা আদরের সুন্দর গরু ছিল, বিরাট সাদা ধপ্‌ধপে। সে ওঁর হাতে খেতে পেত। তাই বোধহয় খাবার লোভে মাঝে মাঝে আমাদের ঘরেও এসে ঢুকত। একেবারে ভিতরে।

একদিন হঠাৎ শোনা গেল তেজবাহাদুরের বাড়ী চোর এসেছিল, তাকে ধরা হয়েছে। আমরা সবাই চোর দেখতে ছুটলাম। দেখলাম, একটা রোগা মত লোককে কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে এসেছে। সীতা বলল, "চোর কই ? ও ত মানুষ।" তখন থেকে আমাদের দুই বোনের একটা খেলা হয়েছিল, 'লক্ষ্মী চোর আর দুষ্টু চোরের'। কোন চোরের কী কর্তব্য তা আজ আর ঠিক মনে পড়ছে না। লক্ষ্মী চোরেরা নিশ্চয়ই চুরি করত না।

একদিন বাবার এক বন্ধু আমাদের বাড়ীতে এসে আমরা কে কী পড়ি জিজ্ঞাসা

করছিলেন। আমি বললাম, "আমি 'চারুপাঠ' পড়ি।" ভদ্রলোক বললেন, "তাহলে তোমার নাম চারুশীলা।" ক্ষুদুকে কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই সে বলল, "আমার নাম দ্বিতীয়শীলা।" সে তখন 'বর্ণপরিচয়' দ্বিতীয় ভাগ পড়ত। আমিই তাকে প্রথম ভাগ পড়তে শিখিয়েছিলাম। তখনকার দিনে আজকালকার মত 'কিশলয়' কিম্বা 'সহজ পাঠ' ছিল না। আমরা দুই ভাগ 'বর্ণপরিচয়' পড়বার পর 'কথামালা', 'বোধোদয়', 'আখ্যানমঞ্জরী', 'চারুপাঠ' তিনভাগ পড়তাম। এগুলি শেষ করবার পর আমি অক্ষয়কুমার দত্তের 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার' পড়তাম। ইংরেজীতে তখন *Royal Readers* পড়া নিয়ম ছিল। তারপর Scott-এর *Ivanhoe, Talisman* প্রভৃতি নভেল। দাদা খুব ছোট বয়েস থেকেই *Encyclopædia* থেকে সুরু করে যে কোন ইংরেজী বই সামনে পেতেন পড়ে যেতেন। ভাষা শেখবার ক্ষমতা তাঁর খুব ছিল। একবার এক সাহেব বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসে বাবাকে না না পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "তার কী হয়েছে?" দাদাকে তখনও বিশেষ ইংরেজী শেখানো হয়নি। কিন্তু দাদা বললেন, "He has caught cold." ইংরেজী না শিখেই ইংরেজী বলছে, মা শুনে দারুণ মুগ্ধ। বাঙালী আর এক ভদ্রলোক বাবার সন্ধান করাতে দাদা বললেন, "তিনি অন্যত্র গিয়েছেন।" ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, "কুত্র?" তাতেও দাদার অটল গাম্ভীর্য নষ্ট হল না। তিনি স্থানটির নাম করলেন। আমাদের বাড়ীতে বইয়ের অভাব ছিল না। *Encyclopædia* ত ছিলই তার উপর আমাদের জন্য সচিত্র *Royal Natural History* চার-পাঁচ খণ্ড কিনে দেওয়া হয়েছিল। তাতে অসংখ্য বাঘ সিংহ হরিণ প্রভৃতির ছবি।

বাবার কলেজের কল্যাণে শেক্সপীয়রের সব বই আলাদা আলাদা খণ্ড ম্যাকমিলান থেকে বাবা পেতেন। লাল লাল মলাটের সেই বইগুলিও দাদাকে নাড়াচাড়া করতে দেখতাম। দাদাকে অ্যাংলো-বেঙ্গলী স্কুলে ভর্তি করে দেবার কিছুদিন পরে দাদার জন্য সংস্কৃত পণ্ডিতও একজন রাখা হয়েছিল। তখন দাদা একটু বড়। যখন তখনই তিনি বারান্দায় পায়চারি করতে করতে আওড়াতেন "কশ্চিৎকান্তা বিরহগুরুণা" অথবা "আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে মেঘমাশ্লিষ্ট সানুম্।" শুনে শুনে আমাদেরও মুখস্থ হয়ে যেত। এমনকি পাণিনির 'ঙ গ ম ড় ণ ম', 'ষ গ প ট দ স' ইত্যাদি সূত্র এখনও মনে পড়ে। দাদা হিন্দিও খুব ভাল বলতে পারতেন।

বাবা নিজের দেশ বাঁকুড়াকে খুব ভালবাসতেন। তাই প্রতি বৎসরই গ্রীষ্মের ছুটিতে আমরা বাঁকুড়া আসতাম। সেখানে পাঠকপাড়ায় বড়পুকুরের কাছে আমাদের

পৈতৃকবাড়ী আর লালবাজারে ওয়েসলিয়ন মিশনের গির্জার পাশে আমাদের মামার বাড়ী ছিল।

আমার দাদামশায় তখন জীবিত ছিলেন, কিন্তু দিদিমা ছিলেন না। দিদিমার মা তখনও বেঁচে। তাঁকে আমি নব্বই বছর বয়সের দেখি। তিনি তখন আমার দাদাকে কোলে নেবার জন্য মহা উৎসুক। আট-নয় বছরের ছেলেকে কোলে নেওয়া নব্বই বছরেও তাঁর মত বীরাঙ্গনার পক্ষে সহজই ছিল। অল্প বয়সে তিনি বাঘ ভল্লুককেও ভয় পেতেন না। একবার তাঁর গোয়ালঘরে বাঘ ঢুকেছিল। ভদ্রমহিলা উনোন থেকে একটা জলন্ত কাঠ নিয়ে তেড়ে গোয়ালঘরে গিয়ে হাজির। বাঘের মুখের মধ্যে জলন্ত কাঠ ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা দেখে বাঘ বেচারী অপ্রস্তত হয়ে পালিয়ে গেল। তাঁর ছেলেরা ঘন বনের ভিতর দিয়ে বোনের বাড়ী যাওয়া-আসা করতেন। একবার তাঁর বড়ছেলে পথে দুটো ভালুকছানা দেখে কুড়িয়ে এনেছিলেন। পরে সারারাত মা-ভালুকটা দরজার কাছে বসে কাঁদতে শুরু করল। মায়ের মামা তখন বাচ্ছাদুটোকে বাইরে বার করে দিলেন। দাদামশায়ের ওঁদা গ্রামে পাকা বাড়ী ছিল, কিন্তু বাঁকুড়া সহরে মাটির বাড়ী করেছিলেন। দাদামশায় ঘটাপটা খুব ভালবাসতেন। তাই বাড়ীতে তাঁর একটা রাজছত্র আর একটা গাদা বন্দুক ছিল। রাজা অবশ্য তিনি ছিলেন না। জমিজমা অনেক ছিল। তার উপর ঘাটশিলার রাজার মোক্তারনামা ছিল। বাঁকুড়া থেকে ঘাটশিলায় ঘন অরণ্যের ভিতর দিয়ে হাতীর পিঠে চড়ে যেতেন, পথে বন্য ভল্লুক ও বন্য হাতীর দলের সঙ্গেও মাঝে মাঝে দেখা-সাক্ষাৎ হয়ে যেত। তাঁর কাছে টানা লাড্ডু কিম্বা বিউলির ডাল খেতে চাইলে চটে যেতেন, বলতেন "রসগোল্লা আর বুটের (ছোলা) ডাল খাবে।"

আমার ঠাকুমা দেবদ্বিজে ভক্তিমতী সাদাসিধা ও সত্যনিষ্ঠ মানুষ ছিলেন। তালাচাবি বন্ধ করতেও পারতেন না, তাই টাকা পয়সা হাঁড়ির মধ্যে রেখে দিতেন। ছোটখাট সওদা করতেন চাল কি ধান দিয়ে—গুণতেও হত না, পোয়া মেপে ঢেলে দিলেই হত। ঠাকুরমার গোয়ালে অনেক গরু আর প্রকাণ্ড সিন্দুকে অনেক মাপের বাটি ছিল। যখন গরুর দুধ বেশী হত তখন ঠাকুরমা বড় বড় বাটি বার করতেন আর যেই দুধ কমে যেত, অমনি বড় বাটিগুলি সিন্দুকে তুলে ছোট ছোট এক প্রস্থ বার করতেন। ঠাকুরমার কাপড় কাচা বাতিক ছিল শকড়ি বিচারের জন্য। একবার একটা মস্ত বড় কার্পেটে কিছু শকড়ির স্পর্শদোষ হয়েছিল—ঠাকুরমা কার্পেটটাকে নিয়ে গিয়ে ফেললেন বড় পুকুরের জলে। জলে ভিজে কার্পেটের ওজন এমন বেড়ে গেল যে ঠাকুরমা তাকে আর টেনে তুলতে পারলেন না। কার্পেটের সলিল সমাধি হয়ে গেল।

আজকালকার মেয়েরা সই পাতানো কাকে বলে অনেকেই জানেন না। সই মানে সখী। সেকালে প্রায় সব মেয়েরই সই থাকত। 'সই' ছাড়া অন্যান্য নাম পাতানোরও চলন ছিল। ঠাকুরমা একবার সাগরসঙ্গম দেখতে গিয়েছিলেন, তাই তাঁর একজন সখী ছিলেন 'সাগরজল'। পরস্পরকে ওঁরা 'সাগরজল' বলে ডাকতেন। ঠাকুরমার ছেলেমেয়েরা এঁকে 'সাগরজল মা' বলে ডাকতেন। সখীদের মধ্যে 'দেখন হাসি' 'ফুল' 'আবীরা' কত কী পাতানোর ঘটা ছিল। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের ভগিনী চারুশীলা ও তাঁর বৌদি পরস্পরকে 'আবীর' বলতেন।

আমরা যখন শিশু তখন ঠাকুরমা প্রয়াগে (এলাহাবাদে) 'কল্পবাস' করতে গিয়েছিলেন। মাঘের কনকনে শীতে গঙ্গাগর্ভে বালুর চরে অড়হর গাছের বেড়ার ঘরে পুণ্যপ্রার্থিনীরা একমাস কল্পবাস করতেন। ঠাকুরমার মত আরও অনেক বর্ষিয়সী মহিলা সেখানে ছিলেন। এবং গঙ্গাগর্ভে বসেও সাংসারিক মানমর্যাদার বিচার করতেন। তাঁদের কার নাতনীর কটা নাম, কার বৌমা ইংরেজী ফার্স্ট বুক পড়ে ফেলেছেন, সবই ঠাকুরমাকে শুনতে হত। আমার স্বল্পভাষিণী পিতামহী শুনে শুনে বিরক্ত হয়ে বলতেন, "আমার সোনার চাঁদ নাতিনাতনীদের একটা করেই নাম, আর আমার বৌমা বাঙলা, ইংরেজী, ফারসী সব পড়তে পারেন।" ঠাকুরমা নাতি-নাতনীদের কাশীশ্বরী, বিশ্বেশ্বরী, কেদারনাথ, এইসব নাম রেখেছিলেন; বিভাবতী, শোভাবতী ওসব তাঁর মাথায় আসত না। ঠাকুমার রূপগুণ সবই গর্ব করবার মত ছিল, কৃতী পুত্রের মাতাও তিনি ছিলেন; কিন্তু তাঁর ব্যবহারে কোন জাঁক ছিল না।

আমার পিতৃকুলে ছিল রামনামের রাজত্ব। অনেকের নামই রাম দিয়ে আরম্ভ। তারপরে কেন হঠাৎ কেউ কেউ বসন্ত, শিশির, হেমন্ত, শরৎ হলেন জানি না।

পাঠকপাড়ার বাড়ীর থেকে লালবাজারে দাদামশায়ের বাড়ীতে আমরা গরুর-গাড়ী চড়ে যেতাম। গাড়ীতে খড় ও সতরঞ্চি পেতে বসবার জায়গা করা থাকত; ওঠবার সময় গরুদুটোকে খুলে নিয়ে গাড়ীটাকে চালু করে রাখত, আমরা আঁকড়ে-পাঁকড়ে উঠে পড়বার পর গাড়ী আবার খাড়া হত। দাদামশায়ের বাড়ীতে দুটো উঠোন ছিল, একটা ভিতর বাড়ীর আর একটা বাহির বাড়ীর। বাহির বাড়ীতে মস্ত বৈঠকখানা ঘর ছাড়া ঢেঁকিশাল ও গোয়ালঘর। ভিতর বাড়ীতে একটা ভিতে উঁচু বারান্দার কোলে দুটি শোবার ঘর, অন্য ভিতে রান্নাঘর। দ্বিতীয় উঠোনের পর একটা দরজা দিয়ে খিড়কির পুকুরে যেতে হত, তাকে বলত গোড়ে। এইখানে বাসন মাজা হত।

দাদামশায়ের বাড়ীর গৃহিণী ছিলেন আমার বড় মাসীমা। তিনি অল্প বয়সেই দুটি ছেলেমেয়ে নিয়ে বিধবা হন। তার উপর তাঁর কুলীনের বাড়ী বিবাহ হওয়ার জন্য দুটি সতীনও ছিলেন। মাসিমার কন্যারও সতীনের ঘরে বিবাহ হয়। কারণ তাঁরাও কুল মেনে চলতেন।

পাঠকপাড়ার বাড়ীটা ছিল পাকাবাড়ী। তখন তার দু-তলায় একখানা মাত্র ঘর। বাকি ঘর সব নীচে একতলায়। বাবার পৈতৃকবাড়ী জীর্ণ হয়ে গিয়েছিল বলে ঠাকুর-মা বর্ষাকালে বড় কষ্ট পেতেন। তাই বাবা সে বাড়ীটা ভেঙে সমস্ত একতলা নূতন করে করেছিলেন তাঁর নিজের উপার্জিত টাকা দিয়ে। আমরা বাবার তৈরী বাড়ীটাই দেখেছি। নীচের যে ঘরে ঠাকুরমা শুতেন সে ঘরে তাঁর মাথার কাছের জানালায় শিক দেওয়া থাকত না, কারণ ঠাকুরমা খোলা আকাশের নীচে মাথা দিয়ে শুতে ভালবাসতেন, তাই তাঁর বিছানার মাথার দিকটা জানালা দিয়ে বার করা থাকত। ঠাকুরমার ছেলেদের নাম ছিল রামশঙ্কর, রামেশ্বর, রামানন্দ আর বারাণসী। ঠাকুরমা ঠাকুর-দেবতার নাম অনুসারে নাতিনাতনীদের নাম রাখতেন, বোধহয় নানা তীর্থও করেছিলেন। বড় ছেলের মেয়ে কাশীশ্বরী, মেজ ছেলের ছেলে বিশ্বেশ্বর আর সেজ ছেলের ছেলে আমার দাদা কেদারনাথ। দাদার রাগ হলে আমাকে বলতেন, "আমি যদি আগে না জন্মাতাম, তাহলে তোর নাম হত কেদারেশ্বরী।"

পাঠকপাড়ায় আমরা সকালে উঠে সরষের তেল মাখানো মুড়ি খেতাম ছোট্ট ছোট্ট পেঁয়াজের সঙ্গে। কখন কখন জলখাবারের সঙ্গে ফুলুরিও খেতে পেতাম। বাড়ীর কাছে বড় পুকুরের ধারে গোপালের বেড় বলে একটি মন্দির ও বাইরের দিকে একটা মস্ত অশ্বত্থ গাছ ছিল। তাতে কয়েকটা হনুমান বসে থাকত। আমি ফুলুরির বাটিটা নিয়ে হনুমান দেখবার জন্যে ছাদে চলে যেতাম। একটা হনুমান টের পেয়ে ছাদে এসে হাজির। আমার ফুলুরি খাওয়া যা হত তা আর বলে কাজ নেই। আমি একটা ফুলুরি মুখে দিতে না দিতেই হনুমানটা হাত পাতত। আমি ভাল-মানুষের মত তাকে ফুলুরি তুলে দিতাম। সে আমার চেয়ে অনেক তাড়াতাড়িই খেত। সুতরাং বাটিটা যখন শেষ হত তখন দেখা যেত আমার পেটে যে ক-টা গিয়েছে তার তিনগুণ খেয়েছে হনুমানটা।

আমার বড়জ্যাঠা মশায়ের পুত্রবধূ ক্ষুদুকে স্নানের সময় তেল মাখিয়ে দেবার জন্য ডাকতেন। ক্ষুদু রেগে একদিন মাকে বলল, "মা, আমি কিন্তু বউদিকে মারব, ও আমার কি একটা 'বিচ্ছিরি' নাম বের করেছে।" মা বললেন, "কি নাম?" বউদি বললেন, "ঠাকুরপো বলে ডেকেছিলাম।" ঠাকুরমার উঠোনে বাঁধা ঝি রাশীকৃত কাঁসার

বাসন ঝক্‌ঝকে করে মেজে উপুড় করে রেখে দিয়ে যেত। পিসিমা আর জ্যাঠাইমা বাসনগুলির উপর আবার একবার জল ঢেলে ধুয়ে সেগুলি রান্নাঘরে তুলতেন। কারণ ঐ ঝিদের জল আচরণীয় নয়। ঢেঁকিশালে একটা ঢেঁকি ছিল, তাতে ধান ছাঁটা হত। একজন মেয়ে ঢেঁকিতে পাড় দিত, আর অন্য একজন গর্তে হাত দিয়ে ধান-গুলো নেড়ে দিত। তাদের কখনও তালে ভুল হত না। যদি গর্তে হাত থাকতেই ঢেঁকি তার উপরে পড়ে, তাহলে হাতটা যায় ছেঁচে। ঢেঁকিতে পাড় দেওয়া ঠিক সি—স খেলার মত, একবার উঁচু একবার নীচু হয়। মনে হয়, মেয়েটি একটানা লাফিয়ে চলেছে।

আমাদের যে বৌদির কথা একটু আগে বললাম, ছেলেবেলায় তাঁর আচরণ আমার কাছে অদ্ভুত লাগত। দিনেরবেলা তাঁর স্বামী যদি তাঁর সামনে দিয়ে হাঁটতেন, তাহলেই বউদি একগলা ঘোমটা টানতেন। কিন্তু রাত্রে তাঁদের ঘরে গিয়ে দেখতাম বউদি স্বামীর সঙ্গে দিব্যি মাথা খুলে গল্প করছেন। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতাম। সামাজিক নিয়ম-কানুন বুঝতে পারতাম না।

শৈশবে যখন এলাহাবাদ থেকে বাঁকুড়া যাওয়া-আসা করতাম, তখন বাঁকুড়া পর্যন্ত রেললাইন ছিল না। আমরা এলাহাবাদ থেকে ট্রেনে চড়ে রাণীগঞ্জে এসে নামতাম। সেখানে যাত্রীদের অপেক্ষা করবার একটা বিচ্ছিরি আস্তানা ছিল—যেমন ময়লা তেমনি ধুলো। তারপর বাঁকুড়া পর্যন্ত যাবার দুটি উপায় মনে পড়ে। এক হল সারারাত ধরে উটের গাড়ী চড়ে, আর এক হল শা কোম্পানীর ঘোড়ার গাড়ী চড়ে। এই পথটা যে কী সুন্দর ছিল, তা এখনও মনে আছে। দু-ধারে শালবন, মাঝখান দিয়ে লাল কাঁকুরে রাস্তা। লম্বা ঋজু শালগাছগুলি ডালপালা বেশী ছড়ায় না। আম, কাঁঠাল, জাম গাছের মত তারা মোটা ভারিক্কী দেখতে নয়; সাঁওতাল মেয়ের মতই যেন আঁট করে কাপড় পরে মাথা খাড়া করে দাঁড়িয়ে থাকে। গাছের তলায় ধুলো-জঞ্জাল নেই, কে যেন ঝাঁট দিয়ে গিয়েছে। মাঝে মাঝে পলাশ গাছ ফুলের সময় লালে লাল হয়ে থাকত, যেন বনে আগুন লেগেছে। খানিকটা করে শালবন যেতে না যেতেই মাঝে মাঝে বিরাট দৈত্যের মত কালো কালো পাথর অনেকখানি জায়গা জুড়ে বসে আছে; কখনও-বা একটা জগদ্দল পাথর যেন একটা-মাত্র বুড়ো আঙুল ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে; তার ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে না। এইসব পথের কিছু কিছু দূরে নদী বয়ে যায়। কোন নদী শুধুই বালি, দেখে মনে হয় অন্তঃসলিলা, কোনটাতেবা একটু ঝির ঝির করে জল চলেছে। উটের গাড়ী দোতলা এবং মস্ত ভারী। একপাল যাত্রী নিয়ে ঐ নদীতে নেমে পড়া গাড়ীর পক্ষে খুব

নিরাপদ নয়। গভীর রাত্রে, মনে আছে, একবার গাড়ী দাঁড় করিয়ে বয়স্ক যাত্রীদের সব নামিয়ে দেওয়া হল। ক্ষুদু বলতেন যে, উট-গাড়ীর সামনে একজন ঘোড়সওয়ার বিউগল বাজাতে বাজাতে যেত, বোধহয় বাঘ তাড়াবার জন্য। আমার ভাল মনে পড়ে না। যাই হোক, বয়স্ক যাত্রীরা নেমে পড়বার পর আমরা কুচোকাচারা গাড়ীতেই রইলাম। গাড়ী হড়াম করে নদীগর্ভে নেমে পড়ল। যাত্রীদের হাঁড়ি-কুড়ি বালতি উলটে-পালটে একাকার হয়ে গেল। যখন তারা আবার গাড়ীতে উঠল, তখন দু-পক্ষে খুব বকাবকি শুরু হয়ে গেল।

'শা কোম্পানী'র গাড়ী কিছুদূর অন্তর ঘোড়া বদল করত; গাড়ী ছোট বলে বেশী যাত্রীও নিত না। আমরা ভাই-বোন ও মা-বাবা ছাড়া আর কেউ গাড়ীতে থাকত মনে পড়ছে না। এই কোম্পানীর ঘোড়াগুলো ছিল ভারী জেদী। যখন নড়বে না ত হাজার পিটলেও নড়বে না। বাঁকুড়ার লোকে তাই জেদী লোককে বলত, 'শা কোম্পানীর ঘোড়া'। ভোরবেলা সূর্য ওঠবার সময় ক্ষুদু গাড়ীর ভিতর বালতিতে দাঁড়িয়েই নৃত্য স্বরু করে দিতেন। আমরা বাঁকুড়া থেকে এইসব গাড়ীতে ফেরবার সময় মস্ত একটা হাঁড়ি ভর্তি করে জিলিপি নিয়ে ফিরতাম, তাকে বলে 'ঝিলপি'। খেতে অমৃতীর চেয়ে সুস্বাদু, রসে টুপটুপে।

এলাহাবাদ স্টেশনে নেমে ঘোড়ার গাড়ী করে বাসার দিকে যেই যাত্রা শুরু করতাম, অমনি একটা জায়গায় একদল লোক 'চুঙ্গি' মাশুল নেবার জন্য মহা কলরব শুরু করত। এটা ছিল একটা মস্ত উৎপাত।

বাঁকুড়ায় যখন রেল লাইন হল তখন বাঁকুড়া স্টেশনে নেমেই দূরে আমাদের মামাবাড়ী দেখতে পেতাম, অনেক বড় বড় মাঠের ওপারে। আজকাল আর সে সব মাঠ নেই, বাড়ীতে বাড়ীতে শহর হয়ে গিয়েছে। খড়পাতা গোরুর গাড়ীর বদলে লোকে এখন সাইকেল রিকশ চড়ে। একটা জিনিস দেখে ভারী অবাক লাগত তখন। স্টেশনে যারা গাড়ী থেকে মাল নামাত, তারা এলাহাবাদের মত পুরুষমানুষ নয়; খাটো লাল পাড় শাড়ী আঁট করে পরা সাঁওতাল মেয়ে। তাদের বলত কামিন। আমরা অবাক হয়ে দেখতাম। কলকাতাতেও স্টেশনে পুরুষমানুষ কুলি। তখন পর্যন্ত দার্জিলিঙের মহিলা কুলিদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়নি। পরে তাদের মাথায় ফিতে দিয়ে পাঁচমনী মাল পিঠে নিয়ে পাহাড়ে উঠতে দেখে সত্যিই হাঁ করে ছিলাম।

আমার ঠাকুরমা মারা যাবার পর ছুটিতে আর আমরা পাঠকপাড়ায় গিয়ে বাস করিনি। বাবা ইস্কুল-ডাঙ্গায় বাড়ী ভাড়া করতেন, আমরা সেই ভাড়া বাড়ীতে উঠ-

তাম। ইস্কুল-ডাঙ্গা পাঠকপাড়ার চেয়ে অনেক খোলামেলা। এলাহাবাদ থেকে আমাদের ঝি রাঁধুনীরা সঙ্গে আসত। রাঁধুনী মহারাজের একজোড়া ভাল জুতো ছিল। সারাদিন রান্নাঘরের পবিত্রতা রক্ষা করতে গিয়ে তার জুতো পরা হত না। তাই রাত্রে কাজকর্ম সেরে সে জুতোজোড়া পরে বেড়াত। ঝি-টি ছিল আয়ার মত। আমার ছোট ভাইকে অর্থাৎ মুলুকে কোলে করে রাখত আর অবসর সময়ে আমাকে এঁচোড়ে পাকাবার চেষ্টায় বদ্ধপরিকর হয়ে নানারকম অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প বলত। সে-রকম গল্প আমি এত বয়সেও আর কখনও শুনিনি। তার নাম ছিল বুধিয়া। তাই শুনে আমার সেজমাসিমা তাঁর এক মেয়ের নাম রাখেন বুধিয়া। ইস্কুল-ডাঙ্গারই একটা বাড়ীতে মুলু জল খেতে গিয়ে কাঁসার গেলাস শুদ্ধ পড়ে গিয়ে ঠোঁট কেটে দু-টুকরো করে ফেলেছিল। তখন ঠোঁট সেলাই করবার জন্য সিভিল সার্জেনকে ডেকে আনতে হল।

বাঁকুড়ায় আমার মাসতুতো আর জ্যেঠতুতো বোনেদের কাছে সেকালের মেয়ে-দের ব্রত করা দেখতাম। তারা উঠোনের মেঝেতে ছোট পুকুর কেটে পুণ্যিপুকুরের ব্রত করত :

"পুণ্যিপুকুর পুষ্পমালা
কে পুজে গো দুপুরবেলা।"

ইত্যাদি বলে। কেউ-বা 'হরির চরণে'র ব্রত করে ছড়া কাটত :

"হরির চরণ হরির পা,
হরি বলেন ওগো মা,
আজ কেন আমার ঠাণ্ডা পা
কোন্ সতী পূজেছে পা ?
সে সতী পুণ্যবতী
সাত ভায়ের বোন সাবিত্রী সতী··· ।"

কিন্তু এইসব বোনেদের সঙ্গে আমরা ঠিক মন খুলে মিশতে পারতাম না। কোথায় যেন একটা বাধা লাগত। হয়ত আমরা বিদেশে থেকে কেমন হয়ে গিয়েছিলাম, নয়ত প্রাচীনপন্থী বাঙালী মেয়েরা আমাদের নিজের করে নিতে পারত না। আমাদের বন্ধু ছিলেন আমাদের ছোটমাসি। ছোটমাসি বয়সে আমার চেয়ে চার-পাঁচ বছরের বড়, কিন্তু চৌদ্দ বছরেও তাঁর বিয়ে হয়ে যায়নি বলে বেশ ছেলেমানুষ ছিলেন। বিয়ের পরেও ইস্কুল-ডাঙায় আমাদের বাড়ীতে আসতেন। দেখতে ছিলেন অবিকল আমার মায়ের ছবির মত ; লোকে দুই বোনকে ভুল করত। ছোটমাসির ধরনধারণ

ছিল খুব সহজ ও সরল। মেছুনীরা ছোটমাসিকে মা মনে করে মাছের দাম চাইত, আর ছোটমাসি হেসে লুটোপুটি খেয়ে যেতেন।

সেকালে ব্রাহ্মণের মেয়েদের অনেকেরই সতীন থাকতেন। আমার দুই পিসি-মারই সতীন ছিলেন। বড়পিসিমা ছিলেন নিঃসন্তান; তাই তিনি প্রায় বাপের বাড়ীতেই থাকতেন। ছোটপিসিমাও অধিকাংশ সময় বাপের বাড়ীতেই কাটাতেন। তাঁর দুই ছেলেই বোধহয় তাঁদের মামার বাড়ীতে থেকে পড়াশুনা করেছিলেন। সন্তানহীনা বড়পিসিমা আমার বাবার পৈতার সময় বাবাকে ভিক্ষা দিয়ে তাঁর ভিক্ষা-মা হয়েছিলেন। তাঁর মাতৃ-হৃদয় সন্তানের জন্য ক্ষুধিত ছিল। তাঁর অন্য দুই ভাইয়ের মাতৃহীন শিশুদের তিনিই মায়ের আদর দিয়ে পালন করেছিলেন। পিসি-মার নিঃসন্তান জীবনের বেদনা আমার বাবা বুঝতেন। যখন পিসিমার মৃত্যু হয়, তখন আমার বাবা পুত্রের মত চুল দাড়ি কামিয়ে তাঁর শ্রাদ্ধ করেছিলেন। কাকার ছেলে হেমন্তকে বড়পিসিমা মানুষ করেন।

ইস্কুল-ডাঙ্গাতেই পরে আমাদের একটা নিজস্ব বাড়ী কেনা হয়। বাঁকুড়া ব্রাহ্ম-সমাজের পাশে এই বাড়ীটি কেদারনাথ কুলভি ও হেমাঙ্গিনী কুলভির করা। মা-বাবা তাঁদের কাছ থেকেই বাড়ীটি কিনেছিলেন। নিজস্ব বাড়ীটায় আমরা বেশীদিন থাকিনি। বাবা কলকাতায় বরাবরের জন্য চলে আসার পরে বাঁকুড়া যাওয়া কমে গিয়েছিল। তবু যতদিন গিয়েছি প্রতিবেশী মহেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ও তাঁর দিদি ছিলেন সবথেকে কাছের। মহেশবাবুর ভাগিনেয় নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত, অমলকুমার সিদ্ধান্ত আর বিমলকুমার সিদ্ধান্তও তাঁদের সঙ্গে থাকতেন। মহেশবাবুর লাইব্রেরী ছিল মস্ত। ছুটির সময় গেলে সীতার কাজ ছিল সেই লাইব্রেরী ঘেঁটে ঘেঁটে ইংরেজী নভেল বার করা। সীতার গল্প পড়ার বাতিক ছিল খুব ছোট বয়স থেকেই। ক্ষুদুর পরে আমাদের আর একটি ছোট ভাই হয়, সে বছর দুই-আড়াই মাত্র বেঁচেছিল। তাকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করত, "সীতু কি করছে?" সে বলত, "ছিপ্ পু দপ্ প দিলছে।" তখন সীতার বয়স মাত্র সাত। মহেশবাবুর লাইব্রেরী আক্রমণ করার সময় সীতার বছর এগার বয়স।

বাঁকুড়াতে সেকালে কলের জল ছিল না। লোকে পুকুরের বা কুয়োর জলেই সাধারণ কাজ করত। কিন্তু খাবার জল আনত গন্ধেশ্বরী (গোঁদাই) নদী থেকে। গন্ধেশ্বরী নদীতে জল দেখা যেত না, শুধুই বালি। লোকে বালিতে গর্ত খুঁড়ে খানিকটা জল ফেলে দিয়ে পরে পিতলের ঘড়ার মুখে কাপড় দিয়ে ছেঁকে সেই জল বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে খেত। জল আনার কাজ ছিল মেয়েদেরই। বিকেলবেলা মেয়েরা

সব দল করে 'জলকে যাবি চল্' বলে বেরোত। আমাদের ইস্কুল-ডাক্তার বাড়ীতে ভাল কুয়ো ছিল, তবুও আমরা গন্ধেশ্বরী থেকেই জল আনাতাম। আমাদের একজন আত্মীয়া জল এনে দিতেন। ওখানে অত পর্দা ছিল না। আমাদের কুয়োতে কপি কল ছিল। তাই দিয়ে জল তুলে বাবা আর আমাদের জ্যেঠতুতো ভাই বিশন-দাদা কুয়াতলাতেই স্নান করতেন। বালতিশুদ্ধ জল বাবা অনায়াসে মাথায় ঢেলে দিতেন। এই বাড়ীটায় আমরা স্বদেশীর সময় কিছুদিন ছিলাম। তখন বিশন-দাদারা স্বদেশী কাপড় ঘাড়ে করে কলকাতার ছেলেদের মত ফিরি করতেন।

বাঁকুড়ায় দেখতাম, ছোট মেয়েরা চুলের গুছি, চুল দিয়ে বোনা দড়ি, ফিতে কাঁটা ফুল নিয়ে এক বাড়ী থেকে আর এক বাড়ীতে চুল বাঁধাতে যেত। ছোট ছোট মেয়েদের মাথায় মস্ত মস্ত খোঁপা। রিবন বাঁধার ফ্যাশন তখনও ওখানে ঢোকেনি। বাংলার বাইরে থাকার দরুণ ও ফ্যাশানটা আমাদেরও শেখা হয়নি। আমার দশ-এগার বছর বয়সে কলকাতা থেকে মায়ের এক ব্রাহ্ম বন্ধু আমাকে হলদে সিল্কের রিবন এনে দিয়েছিলেন। তাঁর নাম ছিল মিস্ দেব। তারপর আর রিবন কিনে-ছিলাম কিনা সন্দেহ। কারণ বাবা ছিলেন স্বদেশী, ওসব বিলাতী জিনিষ স্পর্শ করতে আমরা বিশেষ সুযোগ পেতাম না।

বাঁকুড়ায় আমাদের বড়মাসিমাও আমাদের সঙ্গে বেশ গল্প করতেন, যদিও তিনি ছিলেন মার দিদি। তাঁর কাছে শুনেছিলাম আমাদের দিদিমাও ছিলেন বীরাঙ্গনা। একবার রাত্রে দাদামশায় বাড়ী ছিলেন না। লালবাজারের বাড়ী মাটির। চোরেরা সিঁদ কেটে ঘরে ঢোকবার চেষ্টায় ছিল। দিদিমা একটা দা হাতে সিঁদের কাছে বসে সজোরে বলতে লাগলেন, "এই দা নিয়ে বসলাম, যে মাথা গলাবে তার মাথাটা এক কোপে কেটে ফেলব।" মাথা হারাবার ভয়ে চোরেরা আর মাথা গলাল না। আমরা মামার বাড়ী গেলে মাসিমার কাছে ছাতু (mushroom) আর গুগলির তরকারি খেতে চাইতাম। দাদামশায় শুনলে চটে যেতেন। কিন্তু মাসিমা লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের জন্য করে দিতেন। অন্যান্য আত্মীয়দের কাছে আমরা উপহার বিশেষ পেতাম না, কিন্তু মাসিমা আমাদের পুরী থেকে ক্ষেত্তুরে বাটি এনে দিয়ে-ছিলেন দুই বোনকেই। দাদামশায় অবশ্য মাঝে মাঝে শাড়ী দিতেন। আমরা রঙীন শাড়ী পেলে ক্ষুদু মহা কান্না জুড়ে দিত। সে সাদা ধুতি কিছুতেই নেবে না। তার জন্য নীলাম্বরী শাড়ী কিনে আনা হত। দাদামশায় বলতেন 'বলরাম'।

বড়মাসিমার শ্বশুরবাড়ী ছিল আমরাল বলে একটা গ্রামে। সেখানের অনেক বিখ্যাত রসুইয়ে বামুন কলকাতায় কাজ করতে আসত। তারা দেশে গিয়ে কলকাতার

মেয়েরা কীরকম 'ঘাংরার উপর শাড়ী বেজিয়ে পরে' ইত্যাদি নানা গল্প করত ; মাসিমার কাছে আমরা সে সব শুনতাম।

গরমে বাঁকুড়ায় দুই-তিন মাস কাটিয়ে প্রতিবছরই আমাদের এলাহাবাদে ফিরতে হত। আমাদের ইস্কুল-ডাঙ্গার বাড়ী থেকে শুশুনিয়ার পাহাড় দেখা যেত, যেন একটি বিরাট হাতী হাঁটু গেড়ে বসে আছে স্থির হয়ে। অনেকদিন পর্যন্ত তার কথা মনে পড়ত। স্নান করতে গিয়ে মনে আসত বাঁকুড়ায় বড় পুকুরের ঘাটে মেয়েরা কেমন তেল হলুদের বাটি নিয়ে স্নান করতে যেত, তাদের সাবান মাখার বালাই ছিল না। পুকুরে কাপড় কাচতে গিয়ে শাড়ীগুলো বেলুনের মত ফুলে ফুলে উঠত। ছোট মেয়েরা শাড়ী পড়ত না, ফ্রকেরও চলন ছিল না। তারা ছোট ছোট গামছার মত কাপড় কোমরে জড়িয়ে বেড়াত ; তাকে বলত ট্যানা। একে লুঙ্গি বললেও চলে।

বাবা এলাহাবাদে যাবার অনেক আগে থেকেই ওখানে ব্রাহ্মসমাজ ছিল। বাবা গিয়ে সেটিকে আবার নূতন করে জাগিয়ে তোলেন। এইজন্যই ইন্দুভূষণ রায়কে বাঁকিপুর থেকে এলাহাবাদে আনা হয়েছিল। রবিবারে উপাসনা তিনিই বেশীরভাগ করতেন। নগেন্দ্রনাথ সোম বলে একজন ভদ্রলোককেও উপাসনা করতে দেখেছি মনে হচ্ছে। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় একবার বোধহয় ব্রাহ্মসমাজের কাজেই আমাদের বাড়ী এসেছিলেন। আমরা প্রতি রবিবারে ঘোড়ার গাড়ী চড়ে ব্রহ্মমন্দিরে যেতাম। মা প্রায়ই গানের ভার নিতেন। সমাজে "তোমার পতাকা যারে দাও, তারে বহিবারে দাও শকতি" এবং "বল দাও, মোরে বল দাও" প্রভৃতি তাঁর প্রিয় গান ছিল। ইন্দুভূষণ অন্য গান ছাড়া স্বরচিত "ভিখারী ডাকে দ্বারে হে শুন দয়ার ঠাকুর" ইত্যাদি গেয়ে মানুষের মন ভিজিয়ে দিতেন। কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনকে গানের সঙ্গে সঙ্গে দুলতে দেখতাম।

এলাহাবাদে আমাদের বাড়ীতে বাবা পারিবারিক উপাসনা করতেন। মা গান করতেন, কখন কখন বাবাও তাঁর সঙ্গে গান করতেন। বাবা যে গান করতে পারতেন পরে তা আমরা ভুলেই গিয়েছিলাম। বাবার একটা প্রিয় গান ছিল :

"আমায় অনেক দিয়েছ নাথ,
আমার বাসনা তবু পুরিল না
দীনদশা ঘুচিল না
অশ্রুবারি মুছিল না··· ।"

উপাসনার পর যখন আমরা বারান্দায় পিঁড়ি পেতে, দুধ দিয়ে তৈরী সুজির হালুয়া খেতে বসতাম তখন আমাদের মহারাজের ছোট্ট মেয়ে রজওয়ান্তিয়াও একটি

বাটি নিয়ে আমাদের সঙ্গে বসে যেত। তখন ওখানে গরুর দুধ টাকায় ষোল সের করে। নির্বিচারে খরচ করতে কোন বাধা ছিল না। কড়ায় করে এক কড়া দুধ জাল দেবার পর ক্ষুদ্র কড়াটা চেপে ধরত, "আমি সব দুধটা খাব।" তারপর তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে পরিবেশনের ভার দেওয়া হত। সে হাতায় করে প্রত্যেককে দুধ তুলে তুলে দিয়ে বাকিটা নিজের জন্য রাখত। তার অন্নপ্রাশনের সময় সে একবাটি পায়েসের সমস্তটা খেয়ে নিয়েছিল। বাবা আমাদের ছেলেবেলার এইসব অনেক গল্প বারবার বলতেন। তাঁর মনটা অত্যন্ত স্নেহকোমল ছিল, যদিও ছেলেমেয়েদের আদর করা তাঁর আসত না। তিনি মিষ্টি করে ডেকে বা আমাদের বাল্যকালের গল্প বলে তাঁর স্নেহটা অন্যভাবে বুঝিয়ে দিতেন। আমাদের সঙ্গে বাবার খেলা করা কখনও মনে পড়ে না। তবে আমরা মাঝে মাঝে বাবাকে দিয়ে মেঝেতে ময়না পাখি আঁকিয়ে নিতাম মনে আছে। তাছাড়া সীতা, বাবা কলেজ যাবার আগে খেতে বসলে, তাঁর গলা জড়িয়ে পিঠে ঝুলে থাকত। বাবা তাকে 'ছোটু' বলতেন। খাওয়া হয়ে গেলে মাকে বলতেন, "ছোটুকে নামিয়ে নাও।" সীতা বাবার টুপিটা পরে বলত, "আমি প্রিন্সিপাল সাহেব হয়েছি।"

এলাহাবাদে সন্দেশ রসগোল্লার বালাই ছিল না; কিন্তু বড় বড় পেয়ারা আর বড় বড় আম খেয়ে শেষ করা যেত না; আর ছিল হালুয়া দিয়ে থালাভরা লুচি। পেয়ারার হয় জলের দর, নয়ত বিনা পয়সাতেই জুটে যেত, যদি বাড়ীতে বাগান থাকত। পাকা আমের সময় ঘন দুধে আমের রস দিয়ে তাতে হাতরুটি ছিঁড়ে মেখে খেতে ছিল ভারী মজা। আর সৌখীন ছেলেভুলোনো খাবার লজেন্স ছিল না, ছিল গোলাপী রেউড়ি। বাংলাদেশের তিলকুটের মত। ছ-সাত বৎসর বয়স পর্যন্ত আমি চকোলেট কখনও খাইনি। একবার এক সাহেবের বাড়ীতে বেড়াতে গিয়েছিলাম বাবা-মার সঙ্গে। মেমসাহেব আদর করে চকোলেট খেতে দিলেন। এমন তেতো লাগল যে গলা দিয়ে গলেই না। অথচ ভদ্রতাজ্ঞানও ছিল, তাঁদের সামনে ফেলে দিতে পারলাম না।

রাত্রে রান্নাঘরের সামনে কি ভিতরে—যে বাড়ীতে যেমন খাবার জায়গা—আমরা সারি দিয়ে বসে যেতাম। সবচেয়ে বড় পিঁড়িটার নাম ছিল, "আরামী"। যে সেটা সবার আগে দখল করতে পারত সে বলত "আরামী দখল।" গরম গরম রুটি সেঁকা হলে পাতে পড়ত সঙ্গে সঙ্গে, লুচি হলেও তাই। সব তৈরী করে এনে বেড়ে দেবার নিয়ম ছিল না। অনেকসময় বাড়ীতে অন্য অনেকেও থাকতেন, তাঁরা আমাদের সঙ্গে খেতেন। যখন নেপালবাবু, গিরীশবাবুরা ছিলেন তখন তাঁরা পাল্লা

দিয়ে রুটি খেতেন, কেউ আঠারোটা কেউ কুড়িটা। দুই-একজন বালকও চেষ্টা করত তাঁদের সঙ্গে পাল্লা দিতে। এই রুটি বাজারে কেনা আটার নয়। বাড়ীতে যাঁতা বসানো থাকত। গম-পিস্নী মেয়ে 'পিস্‌নেহর' এসে যাঁতার দুই দিকে পা ছড়িয়ে বসে আটা ভেঙে দিয়ে যেত। তারা অনেকসময় ছোট যাঁতায় করে আস্ত ডাল ভেঙে দিয়ে যেত। সরষের তেলও ছিল খুব সস্তা। বেরিবেরি নামক বিভীষিকার নাম তখন কেউ জানত না। মা একটা বড় মাটির হাঁড়িতে এক হাঁড়ি তেল নিয়ে তার মধ্যে আস্ত আস্ত কাঁচা আমের কসি বের করে নিয়ে, আমের ভিতরে মশলা পুরে আমগুলিকে তেলে ডুবিয়ে রাখতেন আচার করবার জন্য। বড় বড় আস্ত করলাও ভিতরে মশলা ভরে আস্তই ভাজা হত, তার নাম কঁলৌজী। আমি ভোজনে দড় মোটেই ছিলাম না, এমনকি অনেকসময় খেতেই ভুলে যেতাম। তবু এ খাবারগুলি মনে আছে। বাড়ীতে বোধহয় শিশুদের শীতকালে তেল মাখানো হত। একদিন এইরকম কোন কারণে একটা বাটি করে মা তেল রেখেছিলেন। খানিক পরে দেখেন ক্ষুদু আসছেন, তাঁর মাথার থেকে পা পর্যন্ত তেল চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে। মা বললেন, "একি রে?" ক্ষুদু বললে, "তনি সে তেল লাগায় লিয়া রে!" বাটিটা সে মাথায় উপুড় করে ঢেলে দিয়েছিল।

সাউথ রোডের বাড়ীতে রৌশনলালদের একজন দরোয়ান ছিল, সে খুব তুলসী-দাসের রামায়ণ পড়ত গানের মত সুর করে :

"রামচন্দ্র কৃপাল ভগবত সুন্দরম্
ইতিবশেষ তুলসীদাস মুনি মনোরঞ্জনম্।"

এই শ্লোকটি আমরাও আওড়াতাম, হয়ত কিছু ভুল লিখেছি, ঠিক বলতে পারি না।

তাছাড়া মাথায় ছোট পাগড়ী বেঁধে সারেঙ্গী বাজিয়ে গান করতে আসত কোন কোন ভিক্ষাজীবি। তাদের গানের একটু টুকরো এখনও মনে পড়ে। আমরাও গাইতাম :

"কব্ তু ছোড়া গোকুল নগরী
কব্ তু ছোড়া কাশী—
ঝাড়খণ্ডমে আ বিরাজো
বৃন্দাবনকে বাসী
ঠাকুর ভলা বিরাজো হো।"

আমাদের পাশের বাড়ীতে বাগানে তেজবাহাদুরদের বেগুন ক্ষেত ছিল। ক্ষুদু একদিন সেখান থেকে গোটা দুই বেগুন তুলে এনেছিল। মা বললেন, "ছিঃ পরের

বেগুন তুলে আনে না ভালো লোক।" "তুলে আনলে কি হয়?" ক্ষুদু জিজ্ঞাসা করল। মা বললেন, "তুলে আনলে চুরি করা হয়।"

দিন কয়েক পরে বাবার এক বন্ধু বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। ক্ষুদু বললে, "বাবা নেই।" ভদ্রলোক যখন চলে যাচ্ছেন, তখন ক্ষুদু মহা উৎসাহে হাত-তালি দিয়ে বলে উঠল, "আরে ভাগায় দিয়া রে, ভাগায় দিয়া।" মা বললেন, "ও রকম কেন বলছ? উনি ভালো লোক।" ক্ষুদু বলল, "উনি বেগুন চুরি করেন না?"

এলাহাবাদে থাকতে মায়ের দৌলতে রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে আমাদের খুব পরিচয় ছিল, কারণ মা মধুর কণ্ঠে 'কালমৃগয়া'র গান ও ব্রহ্মসঙ্গীত প্রায়ই গাইতেন। আমরাও তাই একটু একটু গাইতে শিখেছিলাম। কিন্তু মানুষ রবীন্দ্রনাথকে ওখানে একদিনমাত্র দেখেছিলাম—আমাদের সাউথ রোডের বাড়ীতে। তিনি বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন, আর আমাদের পাচক মহারাজ তাঁদের নিজের খাটিয়া পেতে বসতে দিয়েছিল। তারপর বাবাকে সে এসে খবর দিল, দু-জন আমীর আদমী এসেছেন। তাঁরা কতকটা পার্শী পোষাকে এসেছিলেন, ভয় ছিল বাবা হয়ত চিনতে পারবেন না। তাই বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "চিনতে পারছেন ত এই পোষাকে?" তখন আমার বয়স খুব কম, ছয় সম্ভবত হবে। —'আমীর আদমী'দের দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম।

ছেলেবেলায় শিলাবৃষ্টির সময় ছোটাছুটি করে শিল কুড়োতে সব শিশুরাই ভাল-বাসে, আমরাও ভালবাসতাম। আমরা যখন সাউথ রোডে খুব ছোট ছোট, তখন একদিন, ১৯০০ সালে ভীষণ শিলাবৃষ্টি হল। আমাদের বাড়ীর বারান্দা ছিল উঠোন থেকে হাত দুই উঁচুতে। দেখতে দেখতে শিলা জমে জমে উঠোনটা বারান্দার সমান উঁচু হয়ে গেল, যেন কেউ শ্বেতপাথর দিয়ে বাঁধিয়ে দিয়েছে। খোলার চাল অসংখ্য ফাটল, গরু বাছুরও মরল ঢের। কিন্তু আমরা সে সব বোঝবার মত বড় ছিলাম না। শিলায় বাঁধানো উঠোন দেখে আমাদের মহা আনন্দ। জীবনে অমন শিলাবৃষ্টি আর কখনও দেখিনি।

সেকালে এলাহাবাদে মোটরকার ছিল না। কাজেই ট্যাক্সি যে ছিল না তা বলাই বাহুল্য। লোকে ঘোড়ার গাড়ী এবং এক্কা গাড়ী ব্যবহার করত। আমরা প্রথম বোধহয় যোগীন চোধুরী মহাশয়ের পুত্র শরৎ চৌধুরীর মোটরগাড়ী দেখে-ছিলাম। স্কুলের মেয়েদের একরকম 'বয়েল গাড়ী' (গোরুর গাড়ী) চড়ে রাস্তা দিয়ে যেতে দেখতাম। বেশীরভাগ লোক এক্কাই ব্যবহার করত। মেয়েরা এক্কায় ঘেরা-টোপের মধ্যে বসত, পুরুষরা খোলা এক্কায় পা ঝুলিয়ে বসত। বাবা এক্কা চড়েন

এটা তাঁর কলেজের ছেলেরা পছন্দ করত না, কিন্তু বাবা মাঝে মাঝে এক্কাতেও চড়তেন। তাতে অন্য কলেজের ছেলেরা কায়স্থ কলেজের প্রিন্সিপ্যালের সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠতাকে ছোট করবার জন্য বলত, "তোদের প্রিন্সিপ্যাল এক্কা চড়েন।" বাবা কলেজে ঘোড়ায়-টানা পাল্কী গাড়ীতে যেতেন, হেঁটেও মাঝে মাঝে যেতেন সাউথ রোডের বাড়ী থেকে। অন্যান্য কলেজের প্রিন্সিপ্যালরা ছিলেন ইংরেজ, কাজেই তাঁদের কায়দা-কানুন আলাদা ছিল। বাবাই প্রথম স্বদেশী প্রিন্সিপ্যাল।

আমাদের শৈশবের অনেক কথা বাবার জীবনীতে লিখেছি। এখানে তার কিছু কিছু পুনরাবৃত্তি হয়ে গেছে।

দাদাকে অ্যাংলো-বেঙ্গলী স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হলেও আমাদের তিনজনকে স্কুলে দেওয়া হয়নি। একবার কথা হয়েছিল কন্‌ভেণ্টে আমাদের দুই বোনকে দেওয়া হবে। কিন্তু সেকালে কন্‌ভেণ্টে ভর্তি হলে একটা ইংরেজী নাম রাখতে হত এবং অন্যান্য আরও কিছু কিছু নিয়ম ছিল যা বাবার মেনে নিতে সম্মানে বাধত। অগত্যা আমরা বাড়ীতেই শেষ পর্যন্ত পড়াশুনা চালিয়েছিলাম এলাহাবাদ-বাসের ঐ কয়টা বৎসর। সুকবি ও সুগায়ক ইন্দুভূষণ রায় হলেন আমাদের মাস্টার। তাঁকে আমরা মেসোমশায় বলতাম। মেসোমশায়কে কোন কথার মানে জিজ্ঞাসা করলেই তিনি বলতেন, "ডিক্‌স্‌নারী দেখ।" অঙ্কেও ফাঁকি দেবার জো ছিল না। এই কারণে সীতা ও ক্ষুদুর খুব রাগ ছিল। তারা বলত, "আপনি যখন থাকবেন না, তখন আপনার সমাধির উপর লিখে রাখব—অঙ্ক কস আর ডিক্‌স্‌নারী দেখ।" ইংরেজী কবিতা পড়িয়ে তিনি সেটা মাঝে মাঝে বাংলা কবিতায় অনুবাদ করতে বলতেন। মিসেস্ হিমান্‌সের একটি কবিতা আমি অনুবাদ করেওছিলাম মনে আছে। পুরাতন পাঠ বারেবারে জিজ্ঞাসা করার অভ্যাস তাঁর ছিল। সীতার তা পছন্দ হত না। তাই মুক্তি পাবার সে একটা উপায় ঠিক করেছিল। একটা পাতা পড়া শেষ হয়ে গেলেই সেই পাতাটা সে ছিঁড়ে ফেলে দিত।

স্কুলের মত করে ত পড়া হত না, কাজেই ইতিহাস, ভূগোল কিছুই শিখিনি, অঙ্কেও Algebra, Geometry জানতাম না। সংস্কৃতটা শিখতে হবে এই ভেবে উপক্রমণিকাটা মুখস্থ করানো হয়েছিল। সেকালে সংস্কৃত-শিক্ষার্থীদের জন্য 'ঋজুপাঠ' বলে একটা বই ছিল। উপক্রমণিকা মুখস্থ করার পর তার প্রথম ভাগটা বোধহয় কিছুদূর পড়েছিলাম।

সাহিত্যের দিকেই আমাদের ঠেলে দেওয়া হয়েছিল যেন। মেসোমশায় পড়ানোর সময় ছাড়া অন্য সময়েও আমাদের নিয়ে কাশীরাম দাস ও কৃত্তিবাসের মহাভারত ও

রামায়ণ সুর করে করে পড়ে শোনাতেন। বারবার শুনে অনেক জায়গা মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। এখনও তাঁর পড়া অনেক লাইন মনে পড়ে :

"রে রে বক নিশাচর আয়রে সত্বর
এত বলি ডাকে ভীম বীর বৃকোদর।"

অথবা :

"দেখ চারু যুগ্ম ভুরু ললাট প্রসার
কি সানন্দ গতি মদমত্ত করিবর
ভুজযুগে নিন্দে নাগ আজানুলম্বিত
করি কর যুগবর বাহু সুললিত।"

কিম্বা :

"ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র নানাজাতি
যে বিন্ধিবে লবে সেই কৃষ্ণা গুণবতী।"

শিশুমনে বকরাক্ষসের গল্প আর অর্জুনের লক্ষ্যভেদের গল্প ছবির মত ফুটে উঠত। বাংলা শব্দ শিক্ষাও এতে সহজ হয়ে গিয়েছিল। কেন জানিনা বকরূপী ধর্মরাজের :

"অপ্রবাসে অঋণে যাহার দিন যায়
যদ্যপি সে অপরাহ্নে শাকান্ন খায়
তথাপি সে জন সুখী সংসার ভিতর
বারি চর, শুন চারি প্রশ্নের উত্তর।"

কবিতাটি আজও মনে আছে। এতে শিশুর চিত্তহরণের উপযুক্ত কোন কথাই নেই। ইংরেজী সাহিত্যের দিকেও আমাদের মনকে একজন টেনে নিয়ে যেতেন। তিনি নেপালচন্দ্র রায় মহাশয়। সীতাকে তিনি একটা *Little Arthur's History of England* এনে দিয়েছিলেন। সীতা সেটা পড়ে পড়ে মুখস্থ করে ফেলেছিল। রাজ-বংশাবলী আগাগোড়া বলে যাওয়া তার ছিল একটা খেলা। নেপালবাবুই উস্কে দিতেন। এছাড়া, তিনি রোজ খোলা আকাশের তলায় বাঁধানো চাতালে সন্ধ্যায় সভা করে 'জিন ভ্যাল জিন', 'মন্টিক্রস্টো', 'থ্রি মাস্কেটিয়ার্স', 'কোরাল আইল্যাণ্ড' কত গল্পই আমাদের বলতেন। নানারকম গল্প শুনে শুনে ছেলেবেলা থেকেই গল্প বলার একটা ইচ্ছা আমাদের দুই বোনের মনে জেগেছিল। মনে মনে নানা গল্প রচনা করে আমরা দু-জনে পরস্পরকে বলতাম। রূপে গুণে, ঐশ্বর্যে আমাদের গল্পের নায়ক-নায়িকাদের যতদূর উঁচুতে আমরা তুলতাম তার চেয়ে উঁচুতে তোলা সম্ভব

ছিল না। কারুর এক একটা গল্প খুব দীর্ঘ হয়ে গেলে তাকে সেইখানে খতম করে দেওয়া হত। এই খেলার নাম ছিল "গপ্‌প ওড়ান্‌"।

আমরা দু-বোন মিলে আমাদের গল্প উপভোগ করতাম, দাদার ছিল তার চেয়েও গোপন একলার গল্প। দাদার একটা খাতা ছিল, তার উপর লেখা থাকত "ইহা কেহ খুলিবে না ও পড়িবে না"। ঠিক ভাষাটা মনে পড়ছে না, কিন্তু বক্তব্যটা ঐরকম। দাদা নিজের মনেই লিখতেন এবং পড়তেন এবং নিজের মনেই মুখ টিপে টিপে হাসতেন। হাসির কারণটা বুঝতে পারতাম না।

আমরা প্রয়াগবাসী হলেও বাংলা আবহাওয়াতেই মানুষ হয়েছিলাম বাবার জন্য। শৈশব থেকেই দেখতাম বাবার বাংলা কাগজ বার করা—হয় 'প্রদীপ' নয় 'প্রবাসী'। ইংরেজী কাগজ বাবার কাছে প্রচুর এলেও আমরা বিশেষ পড়তাম না। দেখতাম বাংলা সাপ্তাহিক 'হিতবাদী', 'বঙ্গবাসী', 'সঞ্জীবনী' কলকাতা থেকে আসত বিছানার চাদরের মত বড় বড়। তাতেই একটু-আধটু আমরা চোখ বুলাতাম। ভাল করে পড়া শুরু হল বঙ্গভঙ্গের পর। খুন, বোমা, জেল, ফাঁসি যতসব রোমহর্ষক ব্যাপার। এখন অবশ্য এ সব ভাতজলের সমান হয়ে দাঁড়িয়েছে। আরও একটা জিনিষ এইরকমই চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল, যা আজকাল হলে কেউ ফিরেও তাকাত না। সেটা হল আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মশায়ের কন্যার বিধবাবিবাহ। ইংরেজী ভাষায় যতরকমের হরফের নাম আছে তার সব পরে পরে সাজিয়ে দিয়ে একটা কাগজে ছাপা হয়েছিল: স্মল পাইকায়—ছিঃ বর্জ্জাইসে—ছিঃ ইত্যাদি ইত্যাদি। আশুতোষ যখন সরস্বতী পদবী পান তখন তাঁর একটা দেবী সরস্বতীরূপী ছবি গোঁফসমেত কাগজে ছাপা হয়েছিল।

সাউথ রোডের বাড়ীতেই ১৩০৮ সালে 'প্রবাসী' প্রথম বাহির হয়। বাড়ীর সব-চেয়ে যে ঘরটা নীচু এবং লম্বা সেই ঘরে 'প্রবাসী'র কাজ হত। কাজ করবার লোক বিশেষ কেউ ছিল না। বাবা এবং মা প্যাক করা ঠিকানা লেখা সব করতেন। আমরা টিকিট লাগাবার জন্য দৌড়ে দৌড়ে বাটি করে জল আনতাম আর টিকিট লাগাতাম। খুব শীঘ্রই বোধহয় আশুবাবু বলে একজন ভদ্রলোক ম্যানেজারের কাজে ভর্তি হন। তবে মা ছিলেন ম্যানেজারের উপরে ম্যানেজার। এরপরে অনাথবাবু বলে আর-একজন ম্যানেজার হন। অনাথবাবুকে আমরা 'থুবু' বলতাম। তাঁর অকস্মাৎ আসল বসন্ত হল। ইন্দুভূষণবাবু ও তাঁর পত্নী রোগীর সেবা হাতে করে করলেন, কিন্তু তাঁকে বাঁচাতে পারলেন না। আমি যখন শৈশবে ভাত রাঁধতাম মনে পড়ছে, তখন থুবুও মাঝে মাঝে 'মাড় পশিয়ে' দিতেন। 'প্রবাসী'র কথা লিখতে গিয়ে মনে

হয় 'দাসী'র কথা। কিন্তু 'দাসী'র যুগ আমার জন্মের আগের সুতরাং স্মৃতিরও বাইরে।

ব্রাহ্মসমাজের উৎসব এলাহাবাদে দু-বার হত—একবার অগ্রহায়ণ আর একবার মাঘে। প্রথমটাতে আমরা সর্বদা উপস্থিত থাকতাম এবং কবিতা গল্প গান ইত্যাদি দিয়ে বালকবালিকা সম্মিলন মাতিয়ে রাখতাম। উৎসবে সীতাকে দিয়ে গল্প বলানো হত। সে সবই ছিল বাংলা। তাছাড়া ওখানে একটা বাঙালী সম্মেলন হত প্রতি বছরে। সেখানে বাংলা কবিতা আবৃত্তি করবার জন্য অনেক ছেলেমেয়েরা জুটত। সেই আমরা প্রথম

"পঞ্চ নদীরতীরে
বেণী পাকাইয়া শিরে
দেখিতে দেখিতে গুরুর মন্ত্রে
জাগিয়া উঠিল শিখ।"

কবিতা জীবনময় রায়ের মুখে আবৃত্তি শুনলাম। শ্রীশবাবুর কন্যা সুজাতা, দুর্গাচরণবাবুর কন্যা প্রতিভা এবং আমার ভগ্নী সীতাও বাঙালী সম্মেলনে আবৃত্তি করতেন। আমি বঞ্চিত হতাম, কারণ আমি বারো বছরেই পর্দানশীন ছিলাম।

রবীন্দ্রনাথের "নদী" কবিতা আমরা ভাইবোনেরা বাড়ীতে সমস্বরে আবৃত্তি করতাম :

"ওরে, তোরা কি জানিস কেউ
জলে ওঠে কেন এত ঢেউ?"

ছেলেবেলা 'মুকুল' আমাদের খুব প্রিয় কাগজ ছিল। তার অন্যান্য লেখকদের মধ্যে শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ও ছিলেন। তাঁর "লে পরসাদ" কিংবা "হবুগবু অশ্বদুটী" কবিতা আমরা গড় গড় করে মুখস্থ বলতাম। এর সঙ্গে তাল রেখে ভাইরা একজন নাচতেন। এখনও একটু একটু মনে পড়ে।

"হবুগবু অশ্বদুটী করতে ছিলেন জলপান,
হেনকালে এলেন তথায় বন্ধু একজন লম্বাকান।
বন্ধু বলেন, হবুগবু এযে দেখি বিষম দায়
একই বংশে জন্ম মোদের জ্ঞাতি সম্পর্কে মোরা ভাই।
কালের দোষে বদল হয়ে, হয়ে গেছে লম্বা কান
খর্বাকৃতি হলাম আমি মোটা লেজটি অন্তর্ধান।"

আর একটি বই ছিল সুকবি কামিনী রায়ের 'গুঞ্জন'। আমরা সেটা সমস্বরে এত সজোরে পড়তাম যে বাবা বলতেন 'হুঙ্কার'। মনে আছে:

"আর রোদ কোথাও নাই, চল বাগানেতে যাই
এই আমার কলসী তোমার খুশী কোথায় ভাই।"

আমাদের বাড়ীতে অতিথিসমাগম নিত্য লেগে থাকত। তার মধ্যে অধিকাংশই বাঙালী। দেশের আত্মীয়স্বজনবন্ধু ছাড়া প্রবাসী ব্রাহ্ম বা প্রবাসী সাহিত্যিকরা প্রয়োজন হলেই আমাদের বাড়ী এসে উঠতেন। যাঁরা কলকাতা থেকে এলাহাবাদে কোন চাকরী নিয়ে যেতেন, তাঁরাও প্রথমে আমাদের বাড়ীতেই উঠতেন। এলাহাবাদে ক্রস থোয়েট গার্লস স্কুল বলে একটা স্কুল ছিল। সেখানে কাজ নিয়ে কবি কামিনী রায়ের ভগ্নী প্রেমকুসুম সেন, রামতনু লাহিড়ীর বংশের শান্তা সরকার ও প্রমদা দেব তিনজন পরে পরে আমাদের বাড়ী এসেছিলেন। এঁদের আত্মীয় নিশীথচন্দ্র সেন ও মিস রাধারাণী লাহিড়ীও এঁদের সঙ্গে এসেছিলেন।

জীবনটা তখন ঘটনাবহুল ছিল না। কিন্তু নানারকম মানুষকে সহজভাবে নেবার অভ্যাস আমাদের হয়ে গিয়েছিল। কেউ পুণ্যকামী তীর্থযাত্রী, কেউ বাপে-খেদানো মায়ে-তাড়ানো ভবঘুরে ছেলে, কেউ চোস্ত সাহেবী পোষাকপরা অধ্যাপক, কেউ গিলে করা পাঞ্জাবীপরা জমীদারপুত্র, কেউ-বা গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী সকলেই আমাদের বাড়ীতে সাদরে একইভাবে অভ্যর্থিত হতেন। সেই পিঁড়ি পেতে খাওয়া, দড়িবোনা বড় বড় চারপাইয়াতে শোওয়া এবং স্বচ্ছন্দমনে যার যতদিন প্রয়োজন থেকে যাওয়া। গৃহী ও সন্ন্যাসীদের মধ্যে কেউ কেউ গল্প বলে আমাদের মনোহরণ করতেন। ভবঘুরে কেউ-বা অকস্মাৎ কাউকে না বলে স্নানের ঘর থেকে বাবার ধুতি পরে অন্তর্হিত হতেন। কোন মারাঠি মহিলা আঠারো হাত শাড়ী একবার কেচে শুকিয়ে এলেই তাকে আবার জল দিয়ে ভিজিয়ে দিতেন নিজের দেশের প্রথামত। কোন সিন্ধী 'বৈগন' খেতে দিলে তিড়বিড় করে উঠতেন।

অতিথিরূপে বাইরের অনেক লোককেই দেখা অভ্যাস ছিল। তাছাড়া খুব ছোট বয়সেই দুই-একটা বড় জিনিষও দেখবার সৌভাগ্য হয়। ১৯০৫-এর কাশী কংগ্রেসে যখন গোপালকৃষ্ণ গোখলে প্রেসিডেন্ট হন, তখন বাবা এলাহাবাদ থেকে ডেলিগেট হয়েছিলেন। তিনি আমাদের সবাইকেই কাশী নিয়ে যান। সেখানে একেশ্বরবাদীদেরও সম্মেলন হচ্ছিল। সেটা ছিল বেনারস ক্যান্টনমেন্টে। হয় স্পেশাল ট্রেনে নয় ঘোড়ার গাড়ীতে আদত কাশী যেতে হত আমাদের। প্রায় প্রত্যহই যেতাম আমরা। সেই প্রথম সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, গোপালকৃষ্ণ গোখলে প্রভৃতিকে

দেখি। গোখলের গোলাপ ফুলের মত রং আর লাল জরিদার পাগড়ী কী চমৎকার লেগেছিল। 'ভারতী'র সম্পাদিকা বিখ্যাত সরলা দেবী তখন নব-বিবাহিতা হয়ে স্বামীর সঙ্গে এসেছিলেন। সোস্যাল কনফারেন্সে মহিলাদের মধ্যে বক্তা ছিলেন হেমন্তকুমারী চৌধুরী ও লেডী বিদ্যারমন ভাই (গগনবিহারী মেহটার শাশুড়ী)। বক্তৃতার সময় হেমন্তকুমারীর কোলে ছেলে ছিল। মনে হচ্ছে যেন অন্যজনেরও ছিল। গগনবিহারীর সুন্দরী শ্যালিকারা তখন ছোট ছোট মেয়ে। রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রী সুন্দরী সুদক্ষিণা দেবীও একজন বক্তা ছিলেন। তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা শুনে একজন মন্তব্য করলেন, 'উসকো ত খপ্‌সুরৎ দেখকে চকেল দিয়া।'

কংগ্রেসে যাবার সময় আমি আমার মায়ের একটা ভাল শাড়ী ধার করে এক-জন ব্রাহ্ম মহিলার কাছে যাই আমাকে পরিয়ে দেবার জন্য। আমার শাড়ী পেয়ে আনন্দ দেখে তাঁর এক বন্ধু বললেন, "দেখেছ, মার একটা শাড়ী পেয়েই কত খুশি। আমাদের এত থেকেও আমরা খুশি হই না।" কথাটা আমার মনে এমন ঘা দিয়ে-ছিল যে আজও ভুলিনি।

প্রথমে অতিথি হিসাবে নেপালবাবুরা আসেন। পরে নেপালবাবু, চারুবাবু প্রভৃতি আমাদের বাড়ীর দীর্ঘকালের বন্ধু হয়ে গিয়েছিলেন; তাঁরা অনেকেই সীতার সঙ্গে মা পাতিয়েছিলেন, কাজেই আমি হতাম তাঁদের মাসিমা। এঁরা আজীবন এই সম্পর্ক রেখেছিলেন। বাবার অন্যান্য বাঙালী বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, মেজর বামনদাস বসু প্রভৃতি। মার সঙ্গে তাঁদের বাড়ীতেও আমরা যেতাম। তাঁরা এলাহাবাদেরই স্থায়ী এবং পুরাতন বাসিন্দা। অনেকেরই বাড়ীতে জনসংখ্যা কম ছিল। কিন্তু শ্রীশবাবু ও বামনদাসবাবুদের পরিবার ছিল বিরাট। তাঁদের মা মাসির থেকে শুরু করে দুই ভাই, দুই বোন, বৌদি, দুই ভাইয়ের ৬।৭টি ছেলেমেয়ে, ভাগ্নে-ভাগ্নী, শালী, বোন, ভগ্নীপতি সকন্যা বিধবা আত্মীয়া সবাই প্রায় একত্রে থাকতেন; বাড়ীর লোকই উনিশ-কুড়িজন সর্বদা। তার উপর অতিথি-অভ্যাগতের ত স্রোত বয়ে যেত। কখন কখন বিশেষ কোন উপলক্ষ থাকলে একশতজনও ঐ বাড়ীর ভিতর ঢুকে বসতেন। বাড়ীটাও ছিল তেমনি, নানাদিকে ঘর যেন গাছের ডালের মত ক্রমেই বেড়ে চলত। এ বাড়ীতে মিস্ত্রী লেগে নেই, এবং কোন দিকে নূতন কিছু হচ্ছে না, এরকম কোন দিন দেখেছি মনেই হয় না। বাড়ীর উঠানে বামন-দাসবাবুর সংগৃহীত পাথরের প্রাচীন মূর্তি অনেকগুলি গড়াগড়ি যেত, যা যে কোন মিউজিয়মে রত্নের মত রাখার যোগ্য। উপরের ঘরে সারি সারি টেবিল ও তাকের উপর অসংখ্য বই। তার উপর এলাহাবাদের ধুলো ঘন হয়ে পড়ত। অত বড় বাড়ীর

অতরকম হাঙ্গামা মিটিয়ে চাকর-বাকরদের বই ঝাড়বার সময়ই হত না। একদিকে রান্নাবাড়ী, সঙ্গে সারি সারি রান্না ও ভাঁড়ার ঘর। সেইখানেই বামনদাসবাবুর মা ও মাসিকে সর্বদা দেখতাম।

আমাদেরই মত এ বাড়ীর মেয়েরাও ইন্দুভূষণ রায় মহাশয়ের কাছে পড়ত। কিন্তু আমাদের চেয়ে অনেক অল্প বয়সে তাদের বিবাহ হয়ে যায়। তখনকার দিনে চোদ্দ বছরের মেয়ে অরক্ষণীয়া ছিল। মেয়েরা খুব গোঁড়া হিন্দু মতে মানুষ হয়নি, বাবা-কাকা উদার ছিলেন বলে। তাই তাঁরা স্বামীর এঁঠো থালায় খাওয়া প্রভৃতি প্রাচীন নিয়মে একটু বিব্রত হতেন। কিন্তু মা-মাসির অনুরোধে সবই করতে হত। বাড়ীতে যদিও ঘরের অভাব ছিল না, তবু বামনদাসবাবু শীত গ্রীষ্ম সবসময় খোলা আকাশের তলায় শুতে ভালবাসতেন। তাঁর স্ত্রী জীবিত ছিলেন না, সন্তান ছিল একটিমাত্র পুত্র। হিন্দু সমাজে কন্যার বিবাহে কন্যার পিতামাতাকে যে পরিমাণ মাথা হেঁট করতে হয়, তাতে শ্রীশবাবুর সম্মান অত্যন্ত আহত হত। দুই কন্যার বিবাহের পর শুনেছি তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তৃতীয়া কন্যার বিবাহ যদি আপনা হতে না হয় ত তিনি তার বিবাহই দেবেন না।

ধর্ম সম্বন্ধে এঁদের বাড়ীতে খুব উদারতা ছিল। ওঁদের এক ভগ্নী ছিলেন ব্রাহ্ম, বামনদাসবাবু স্বয়ং খানিকটা শিখধর্মের অনুরাগী ছিলেন, শ্রীশবাবু ছিলেন থিয়সফিস্ট এবং কায়স্থদের উপবীতের অধিকারী মনে করতেন। ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে এঁদের বাড়ীর ছেলেমেয়েরা সর্বদা আসত। শুনেছি একসময় শ্রীশবাবু ব্রাহ্ম হয়েছিলেন। বামনদাসবাবু খুব ভাল চিকিৎসক ছিলেন। কিন্তু তাঁর মা বলতেন, "বামনদাসের শুধু দুটো ওষুধ আছে।" বামনদাসবাবুকে মুলু বলত "আমাল ডাকালবাবু।"

আমরা ছোটবেলা মাঘোৎসবে অনেক সময় কলকাতায় চলে আসতাম। কখনও মফঃস্বলের ব্রাহ্মদের জন্য ভাড়া করা বাড়ীতে থাকতাম, কখনও অন্য কোথাও। একবার ছিলাম ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্য মহাশয়ের বাড়ীতে। তাঁর তখন একটিমাত্র কন্যা। মাঘোৎসবে বালক-বালিকা সম্মেলনেই ছিল সবচেয়ে ঘটা। ফুলের মালা, গোলাপের তোড়া ত ছিলই, তার উপরে পাত পেড়ে বিকাল থেকে রাত দশটা পর্যন্ত প্রস্থে প্রস্থে লোক খাওয়ানো। প্রথম দ্বিতীয় দল বালক-বালিকা, ক্রমে মফঃস্বলের ব্রাহ্ম নাম করে আশেপাশে যে যেখানে থাকত প্রায় সবাই সারি বেঁধে খেতে বসে যেত। বালক-বালিকার দৌলতে বোধহয় তিনপুরুষ পর্যন্ত খাওয়া চলত। সেদিন নিমন্ত্রণকর্তা থাকতেন ডাঃ নীলরতন সরকার। তাঁরা ভাই-ভগ্নী মিলে কী পরিমাণ পরিশ্রম যে করতেন এখনও মনে পড়ে। মন্দিরের ভিতরে বালক-বালিকা-

দের গল্প বলতে আসতেন অন্যদের সঙ্গে অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ। তিনি খাঁটি সাহেবী পোষাকে আসতেন, এবং গল্পের শেষে বোধহয় অনাথ আশ্রমের জন্য ছেলেমেয়েদের সামনে হ্যাট পেতে ভিক্ষা নিতেন। অনেক ছোট ছেলে বলত, "ঐ যে গরীব সাহেব, যাঁর কিচ্ছু নেই, তাঁকে আমরা পয়সা দিই।" পয়সা দেবার জন্য ছেলেদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যেত।

উৎসবের পর আবার প্রয়াগে প্রস্থান। প্রয়াগ বহুকালের তীর্থস্থান। কথায় বলে, "প্রয়াগে মুড়ায়ে মাথা, মরগে পাপী যথা তথা।" সেই প্রয়াগ তীর্থে ত্রিবেণীর তীরে নিত্যই স্নানযাত্রীর ভীড় লেগে থাকত। কিন্তু প্রচণ্ড ভীড় হত মাঘ মেলার সময়। একমাস ধরে মাঘ মাসে সারা ভারতবর্ষের পুণ্যকামীরা এখানে আসতেন। তখন কুম্ভ মেলা হত বারো বৎসর অন্তর। সে এক অতুলনীয় বিরাট জনতা। স্পেশ্যাল ট্রেন, মালগাড়ী সবই তীর্থযাত্রীতে বোঝাই। হিমাচল থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত যাত্রীরা স্নানের জন্য এলাহাবাদে ছুটতেন। আমরা বাংলা ১৩১২ সালে কুম্ভ মেলা দেখি। কত লক্ষ লোক যে জমা হয়েছিল জানি না। ধর্মশালা, হোটেল, বন্ধুবান্ধবদের বাড়ী, গাছতলা সর্বত্রই যাত্রীর আস্তানা। আমাদের বাড়ীতেও বহু যাত্রী এসেছিলেন। ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে হিন্দুস্থানী মনিঅর্ডারওয়ালার বেয়ান থেকে বাঙালী খ্যাতনামা উকিল-পরিবার পর্যন্ত অনেকেই এলেন; এমন-কি সন্ন্যাসিনীও একজন এসে হাজির। কুম্ভ মেলায় রোজ মিছিল বেরোত; আমরা প্রায় সারাদিনই পথের ধারের জানালার কাছে হাজিরা দিতাম, পাছে কোন দ্রষ্টব্য থেকে বঞ্চিত হয়ে যাই। জরিজড়োয়া পরা মোহান্তদের হাতীর মিছিল, উদ্‌গ্রীব নাগা সন্ন্যাসীদের 'ভাণ্ডারা' (ভোজ) খাওয়ার মিছিল, আলুলায়িতকুন্তলা ত্রিশূলধারিণী ভৈরবীদের মিছিল কোনটারই অভাব ছিল না। বড় বড় সন্ন্যাসীদের তাঁবুতে তাঁবুতে আখড়া ছিল। সেখানে চাঁদোয়ার তলায় সভা ও বক্তৃতা হত। আমরা ছোটবড় অনেকে মিলে দল করে এইসব আখড়া দেখতে যেতাম। সঙ্গে বাবার ছাত্র নিরালম্বস্বামী থাকাতে খুব সুবিধা হত। ইনি পূর্বে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে পরিচিত ছিলেন। অরবিন্দ-বারীন্দ্রদের সহকর্মী ছিলেন এককালে। এ সময় আমাদের বাড়ীতেই অতিথিরূপে এসেছিলেন, আমার মাকে 'মা' বলতেন এবং আমাদের হিমালয়ের দুর্গম পথে ভ্রমণের গল্প বলতেন। সন্ন্যাসীরা কতরকম প্রায়শ্চিত্ত করতেন তার ঠিক নেই। কেউ 'খড়ে রহা বাবা' রূপে সাত বছর দাঁড়িয়ে, কেউ বা পেরেকের বিছানায় শুয়ে কাটাতেন। আমরা প্রয়াগের অক্ষয়বট, নদীর পারের ঝুঁসি, আবার খসরুবাগ ইত্যাদিও দেখে বেড়াতাম।

এলফ্রেড পার্কের কাছের বাড়ীতে আমাদের প্রতিবেশী ছিলেন সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর ভাইরা। তাঁদের বাড়ীতে দুর্গোৎসব হত। আমাদের বাড়ীতে মাকে আমরা আগমনীর গান গাইতে অনেক সময় শুনতাম :

"গিরিরাজ, আমার গৌরী এসেছিল—
স্বপ্নে দেখা দিয়ে চৈতন্য হরিয়ে
চৈতন্যরূপিণী কোথা লুকাইল ?"

কন্যারূপিণী দুর্গার একটা ছবি মনে ফুটে উঠত। কিন্তু বাস্তব দুর্গোৎসব আমরা ভয়ে প্রায় দেখতেই যেতাম না। 'মাগো করুণাময়ী' বলে যখন একটা ফরসা হাতে বলির খাঁড়াটা দেয়ালের ওপার থেকে দেখা যেত তখন আমরা কানে আঙুল দিয়ে দৌড় দিতাম। অন্য সময়ে ও বাড়ীর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আমাদের খুব ভাব ছিল। বাড়ীতে নবজাত শিশুর জন্যে আটকৌড়ে হলে আমাদের ডাক পড়ত। আমরা ভাজাভুজির সঙ্গে একটা করে চকচকে দু-আনি দক্ষিণা নিয়ে চলে আসতাম।

এরপর সাহেবপাড়ার আরও কয়েকটা বাড়ীতে আমরা পরপর ছিলাম। কোনটাকে বলতাম সিমিয়নের বাংলো, কোনটা ছিল হ্যামিল্টনের বাংলো। এই পাড়াতে দাদাদের একটা ফুটবল টিম ছিল। তার সভ্য ছিলেন সমর গুপ্ত (পরে আর্টিস্টরূপে বিখ্যাত), জীবনময় রায়, সুশীল চৌধুরী (পরে বার-এট ল), ইন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বাঙালী ছেলেরা। দাদাই বোধহয় সবচেয়ে ছোট ছিলেন। সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীর মেয়েদের ডাকনাম ছিল মটুক, বুড়ণ, অন্তি। পাঁচিলের দু-পাশে দু-দল দাঁড়িয়ে আমরা গল্প করতাম। ইন্দু সতীশবাবুর পুত্র।

এই বাড়ীতে আমাদের খেলার সাথী ছিল, টোবি নামে একটি সাদা টেরিয়ার কুকুর। তাকে নিয়ে আমরা ছুটোছুটি করতাম। কিন্তু বেচারী কারুর নির্বুদ্ধিতায় অথবা দুষ্টুমিতে অসময়ে মারা গেল। আমরা ভাইবোনেরা শোকার্তভাবে তার গোর দিয়েছিলাম।

এ সব জায়গায় বাঙালী অভিজাত প্রতিবেশীই থাকতেন, আদত হিন্দুস্থানী জীবন বেশী দেখা যেত না। ঝি চাকর রাঁধুনী ছিল হিন্দুস্থানী, অন্য পাড়াপড়শী বা বন্ধু কেউ হিন্দুস্থানী ছিল না। বাড়ীর যে জমাদার সে সাহেববাড়ীর জমাদার বলে সাজপোষাক কায়দাকানুন খুব দুরস্ত ছিল। তাদের জাত লালবেগী, বাড়ীর মেয়েরা রীতিমত সুন্দরী ও সুসজ্জিতা। ঝাঁটা হাতে আসত বটে, কিন্তু রাজকন্যা সাজালেও অনায়াসে মানিয়ে যেত। সাহেববাড়ীতে তারা রান্নাঘরেও কাজ করত।

অশোকের পর অনিল, সিভিল লাইনসেরই একটি বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করে।

আড়াই বৎসর বয়সে দুরন্ত ডিপথিরিয়া রোগে তার মৃত্যু হয়। ভারি মিষ্টি কথা বলত সে। মুলু কোন্ বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেছিল ভাল মনে পড়ে না। সিভিল লাইনসেরই কোন একটি বাড়ীতে। সেই বাড়ীতে আমাদের একটা প্রিয় কুকুর ছিল যার পাঁচটা বাচ্চা হয়েছিল। সুহৃ তাদের নামকরণ করেছিল। দুটো ছিল সুন্দর বাচ্চা, তাদের নাম বুল্লা আর খুল্লা এবং তিনটে ছিল বিচ্ছিরি রোগা বাচ্চা, তাদের নাম নেংটি, পেংটি আর শুঁটকি। মা-টা কিন্তু বেশ মোটা আর সুন্দর দেখতে, খানিকটা স্প্যানিয়ালের মত।

এরপর আমরা সিভিল লাইন্স ছেড়ে মেঘরাজ নামক এক হিন্দুস্থানীর কীটগঞ্জের বাড়ীতে চলে যাই। এই মেঘরাজ বর্মায় রেল লাইনে কাজ করতে করতে এক ঘড়া মোহর পেয়ে যায়। ফলে তার আর কাজ করতে হয়নি আজীবন। সে এক বেগম সাহেবার ৩০।৪০ বিঘার সম্পত্তি কিনে বসে। সেখানে বাড়ীই ছিল তিনটি তার উপর ফুল বাগান, ধান ক্ষেত, গম ক্ষেত, অজস্র ফলের বাগান সবই ছিল। আমরা এখানে অনেকে মিলে ভীড় করে থাকতাম, বড় নির্জন জায়গা। ইন্দুভূষণবাবু সপরিবারে এবং নেপালবাবু ও গিরীশবাবু সবাই আমরা ছিলাম এক পরিবার ভুক্ত। রান্না খাওয়া সব একত্রে। কলের জল ছাড়া বাড়ীতে একটা মস্ত ইঁদারা ছিল, বোধহয় ক্ষেতে জল দেবার জন্য। বিরাট একটা ডোল কিংবা মশক দড়িতে ঝোলান থাকত, আর এক জোড়া বলদ তাতে করে জল তুলত। ইঁদারাটা ছিল খুব উঁচুতে, সেখান থেকে লম্বা একটা ঢালু পথ অনেক দূর নেমে গিয়েছিল। বলদজোড়া যখন ঢালু পথ দিয়ে গড় গড় করে নেমে যেত, তখন জল ভর্তি মশকটা কুয়া থেকে উঠে পড়ত। আবার যেই তারা উপর দিকে উঠে আসত তখন শূন্য মশকটাকে ছেড়ে দিলেই সেটা জলের মধ্যে গিয়ে পড়ত। মানুষের কোন পরিশ্রম ছিল না।

এলাকাটা এতই বড় যে সেখান থেকে চারদিকে অনায়াসে যাওয়া যেত না। কেবল একদিকের একটা গেট একটা বড় রাস্তার ধারে মোটামুটি লোকালয়ের সঙ্গে যোগ রাখত। এইজন্য এখানে চোরডাকাতের উপদ্রবও বেশ ছিল। সারাদিন চৌকিদার ও চৌকিদারীন পাহারা দিত। চৌকিদারীন স্ত্রীলোক হলেও মস্ত বীরাঙ্গনা। একলা লণ্ঠন নিয়ে নিশুতি রাতে বেশ ঘুরে বেড়াত। কিছুদিন পরে এরা স্বামী-স্ত্রী পায়ে হেঁটে প্রয়াগ থেকে শ্রীক্ষেত্রে তীর্থ করতে গিয়েছিল। স্বামী বোধহয় জীবিত ফিরে আসেনি, চৌকিদারীন এসেছিল। যাই হোক এখানে শুধু যে চোরডাকাত ছিল তাই নয়, বেগম সাহেবার কবরের কাছে বিরাট একটা অজগরের বাস

ছিল। কোন কোন দিন রাত্রে চৌকিদার চীৎকার করে বলত,'বাবু,অজগরা'। আমি ছেলেবেলায় নির্ভীক ছিলাম। ঐ সমাধির কাছে বেড়াতে গিয়ে দেখেছি মস্ত মোটা আর লম্বা অজগর ধীরমন্থর গতিতে ঘাসের ভিতর দিয়ে চলে যাচ্ছে। আমাদের দিকে ফিরেও তাকাত না। বাড়ীতেও মাঝে মাঝে সাপ বেরোত।

এইখানে এক রাত্রে একটা ভীষণ কাণ্ড হল। সে বাড়ীর ঘরগুলো মস্ত মস্ত, এক একটা ঘরেই এক এক পরিবারের সকলের স্থান হয়ে যেত। রাত্রে যে যার ঘরে দরজা বন্ধ করে শুয়েছি। অনেকক্ষণ পরে দরজায় খট্ খট্ করে আওয়াজ হতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে আর সাড়া পাওয়া যায় না। মেসোমশায়ের বড় ছেলে প্রতিভারঞ্জন হঠাৎ এইসময়ে বাইরের দরজা খুলে বেরিয়ে পড়েছেন। দেখেন ইঁদারার উঁচু পাড়ের উপর একদল লোক দাঁড়িয়ে। 'কোন হ্যায় রে' বলতেই উত্তর হল 'মেহ-মান' (অতিথি)। চোরেরা নিজেদের 'মেহমান' বলত। প্রতিভারঞ্জন 'দাঁড়াও আলো এনে দেখি' বলে চট্ করে একটা ডুমওয়ালা ল্যাম্প নিয়ে বেরিয়ে এলেন। অমনি বর্ষার ফলকের মত তীক্ষ্ণ দীর্ঘ একটা লাঠি সজোরে এসে তাঁর কপালে লাগল। কপাল ফেটে দুই ফাঁক। সাদা ডুমওয়ালা ল্যাম্প রক্তে লালে লাল হয়ে গেল। বাড়ীসুদ্ধ কারও যেন ভয়ডর ছিল না, শিশু বৃদ্ধ যুবা সবাই খোলা আকাশের তলায় তখনই বার হয়ে পড়লেন। বড়রা চীৎকার করে পুলিশ ডাকাডাকি করলেন। ইন্দু-বাবু ও আমার বাবা ২।৩টা খাট টপকে অন্ধকারে লাঠি হাতে বিদ্যুৎ বেগে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন। কী অদ্ভুত সাহস! যাই হোক চোরদের চিহ্ন দেখা গেল না। পুলিশ দারোগা সবই একে একে দেখা দিল। মাস দুই ফাটা মাথা নিয়ে প্রতিভা-রঞ্জন পড়ে রইলেন, রোজ ডাক্তার এসে ব্যাণ্ডেজ করে দিয়ে যেত।

তাঁর শরীর দুর্বল দেখে মাসিমা তাঁকে প্রত্যহ একতাল মাখন আর মিছরি খাওয়াতেন। এতে জীবনদাদার মনে বড়ই দুঃখ হত, তিনি প্রাণপণে নিজের শারী-রিক দুর্বলতা মাকে বোঝাতে চেষ্টা করতেন, যাতে তাঁর ভাগ্যেও একটু মাখন মিছরি জোটে। ভাল হয়ে ওঠার পর দুই ভাইয়ে মাঝে মাঝে ঝুটোপুটি লেগে যেত নানা কারণে। একবার ঝগড়ার পর জীবন মস্ত এক কবিতা লিখে বসলেন, তার আরম্ভ প্রাচীন স্টাইলে :

"একি হল আজ, একি হল আজ
দাদা যে আমারে মারিল বৃথা।
তাড়াতাড়ি আমি বলিয়া দিলাম
আসিলেন তারে বকিতে মাতা।"

আমাদের ছেলেবেলায় মাকে 'বামাবোধিনী' পত্রিকা নিতে দেখতাম। তাতে "একি হল আজ, একি হল আজ" বলে শুরু করা অনেক কবিতা থাকত। মানকুমারী, গিরীন্দ্রমোহিনীরা লিখতেন। 'বামাবোধিনী' ছাড়া ছোট মাপের 'ভারতী'ও আসত, আর আসত 'বান্ধব' বলে একটি পত্রিকা। কিছু বড় হলে পড়ে দেখেছি, 'বান্ধবে' প্রেততত্ত্ব বিষয়ে অনেক সত্য ঘটনা বার হত।

এই বাড়ীতে মুলুকে ছোট্ট আনা হয়েছিল। তাকে আমরা তখন মুকু কিংবা মুকুতা বলে ডাকতাম। জীবনদা তাকে একটা কার্ড লিখে দিয়েছিল :

"মুকুতার হাতে আমি মুকুতা তোমারে
দিলাম এ কার্ডখানি অতীব সাদরে।"

জীবনদা মানুষটা চিরকালই স্নেহশীল, ৪।৫ বৎসর বয়সে আমার যে নাক টিপে ধরেছিলেন, সেটা তাঁর একটা খেলা মনে হয়েছিল। ওর ফল যে মারাত্মক সে জ্ঞান তার ছিল না। অত ছোট ছেলের ও জ্ঞান থাকা সম্ভব নয়।

মেঘরাজের তিনটা বাড়ীর মধ্যে যেটা সবচেয়ে বড়, সেটার একেবারে বাদশাহী পরিধি। আমরা প্রথম কয়েক মাস সে বাড়ীতেও ছিলাম। তার একটা বারান্দা এত বড় ছিল যে আমরা বড়-ছোট মিলে আট-নয়জন তাতে রীতিমত ফুটবল খেলতাম। নেপালবাবুও আমাদের ভাইবোনদের সঙ্গে একজন খেলোয়াড় ছিলেন। ছোটদের সঙ্গে খেলতে তাঁর খুব ভাল লাগত।

যখন আমরা সাউথ রোডে ছিলাম তখন নেপালবাবু ও গিরীশবাবু কিছুদিন পরে ঐখানেই একটা ছোট বাড়ীতে উঠে যান। বিজয়কৃষ্ণ বসু বলে আর একজন মাস্টারও তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। এলাহাবাদে নেপালবাবু অ্যাংলো-বেঙ্গলী স্কুলের হেডমাস্টার হয়ে এসেছিলেন। দাদা ও জীবনদাদা ছিলেন সেই স্কুলের ছাত্র। নেপালবাবু খুব তাড়াতাড়ি কাজ করতে পারতেন না। এটা কোথায়, সেটা কোথায় করতে করতে তাঁর দেরী হয়ে যেত। তবু তিনি এই দুই ছাত্রকে বলতেন, 'তোমরা যদি আমার পরে স্কুলে পৌঁছাও ত তোমাদের late লিখে দেব।' ছাত্ররা বলত, 'যদি আপনি দেরীতে পৌঁছান ত আপনাকে late লিখিয়ে দেব।' ভাত খাবার পরে তিনজনেই রেস দিয়ে স্কুলের দিকে দৌড়তেন। স্কুলটা বেশী দূরে ছিল না। অধিকাংশ সময়ে নেপালবাবুরই দেরী হত। কলকাতায় 'ল' পরীক্ষা দেবার জন্য যখন মাঝে মাঝে যেতেন তখনও দেরী করে ফেলার জন্য মাঝে মাঝে তাঁর ট্রেন ফেল হত। নেপালবাবু সকলের সঙ্গেই খুব গল্প করতেন, ছোট-বড় বিচার ছিল না। কিন্তু সেকালের ব্রাহ্মদের মত সংযম শিক্ষার উপরেও তাঁর ঝোঁক ছিল। ছেলেবেলায়

দেখেছি সপ্তাহে একদিন তিনি মৌনব্রত পালন করতেন। সেদিন তিনি কারও সঙ্গে কথা না বলে ইসারায় সব কথা বুঝিয়ে দিতেন।

মেঘরাজের বাংলোতে নেপালবাবু রোজ প্রাতর্ভ্রমণে বেরোতেন। সঙ্গী থাকতাম আমি আর সোহিনীদিদি (ইন্দুবাবুর কন্যা)। ভোরবেলা উঠে নেপালবাবু 'আমার মুজো কোথায়, জুতো কোথায়' বলে হাঁকাহাঁকি করতেন। শেষে সোহিনীদিদি ঠিক করলেন আগের রাত্রে তিনি সব গুছিয়ে রেখে দেবেন। আমার তখন ৯।১০ বৎসর বয়স, আমি কিন্তু ওদের সঙ্গে ধুলোভরা পথে নিমগাছ আর শিশুগাছের তলায় তলায় বেশ মাইল তিনেক রোজ ঘুরে আসতাম। আগে নেপালবাবু কখনও কখনও দু-পায়ে দু-রকম মোজা পরেই বেরিয়ে পড়তেন।

মেঘরাজের বাংলোয় আমের সময় নেপালবাবুর আর একটা কাজ ছিল আম কেনা। সকালবেলা বড় বড় ঝুড়ি মাথায় আমওয়ালারা ক্রমাগত ফিরি করতে বেরোত। নেপালবাবু আমাদের দুই-একজনকে সঙ্গে নিয়ে গেটের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেন। আম সস্তাই ছিল, তাই আমওয়ালারা একটা করে আম চাখতে দিত। ৮।১০ জনের আম চেখে আমাদের প্রচুর আম খাওয়া হয়ে যেত। তারপর হত একজনের কাছে শ-হিসাবে আম কেনা। একশ আমের দাম খুব একটা বেশী ছিল না। রাতের আহারের সময় ক্ষীর আর রুটির সঙ্গে আম মেখে খাওয়ায় খুব আনন্দ ছিল।

মেঘরাজের বাংলোয় থাকতে নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শনে' 'নৌকাডুবি' ও 'চোখের বালি' বেরিয়েছিল মনে হচ্ছে। বাড়ীতে কাগজ এলেই কাড়াকাড়ি পড়ে যেত। মা, সোহিনীদিদি ও নেপালবাবু তিনজন ছিলেন প্রধান পড়ুয়া। আমরা তখনও ছেলেমানুষ। তবে 'হিতবাদী' প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনাবলী পড়তাম। ওতেই পড়েছিলাম বিলাত যাত্রাকালে কবির বাক্সের উপর নির্দয়ভাবে নৃত্য করার কথা।

কিছুদিন নেপালবাবু তাঁর স্ত্রী-পুত্রকেও এনেছিলেন। তখন তাঁরা আলাদা বাড়ীতে ছিলেন। নেপালবাবুর একজন সুন্দরী বালবিধবা দিদি ছিলেন। খুব হাসি হাসি মুখ। নেপালবাবুর ছেলে কালীপদ ভারি মজার মজার কথা বলত। আমার ছোট ভাই মুলুর হজম ভাল হত না বলে ঘুঁটের জালে তাঁর জন্যে পোরের ভাত হত মাটির হাঁড়িতে। কালীপদ বিস্মিত হয়ে বলত, 'মুলু কি বেম্ব হইছে?' মেসোমশায় একাদশীতে উপবাস করতেন ও থান ধুতি পরতেন বলে কালীপদ মেসোমশাইয়ের বৈধব্য ঘটেছে কিনা প্রশ্ন করত। নেপালবাবুর একজন ভাগিনেয় ছিল, সে আমার বাবাকে বুড়াবাবু বলত, কারণ অল্প বয়সেই বাবার সব চুল পেকে যায়। মাসিমা একদিন তাকে বললেন, "বুড়াবাবু বুড়াবাবু বলো না। জান, উনি এম্. এ. পাশ।" ছেলেটি

বললে, "এম্. এ. পাশ ? আমি মনে করলাম ইনটিন্সে পাশ। কই, এট্টাও ত ইংরেজী কথা কইতে শুনি না।" বাবার বাংলার সঙ্গে ইংরেজী মিশিয়ে না বলায় এবং লেখার সময় বড় বড় পাণ্ডিত্যপূর্ণ কথা ও অলঙ্কার ব্যবহার না করায় একজন সাহিত্যিকও একবার বিস্ময়প্রকাশ করেছিলেন।

হিন্দুস্থানী জীবনের কয়েকটা জিনিষ আমরা একটু দূরে থাকলেও দেখতে পেতাম। সেটা উচ্চশ্রেণীর মধ্যে ছিল কিনা জানি না। অনেক সময় রাস্তা দিয়ে এক-দল মেয়ে নাচতে নাচতে যেত বিশেষ একটি মেয়েকে ঘিরে। নাচের কারণ, ঐ বিশেষ মেয়েটির ভাইপোর জন্মগ্রহণ। তাই পিসিকে নাচতে হবে। যখন কোন দূর জায়গা থেকে একজন আত্মীয়া আরেকজন আত্মীয়ার বাড়ী আসত তখন প্রথমেই তারা পরস্পরের গলা জড়িয়ে বেশ খানিকটা কেঁদে নিত। একে বলে 'ভেট' করা। কান্না শেষ হয়ে গেলেই দু-জনে নানা হাসি গল্প শুরু করে দিত। ভৃত্যমহলে এইরূপ ভেট করা প্রায় দেখতাম মেয়েদের মধ্যে।

ওদেশে বর বড় কি কনে বড় নিয়ে সবাই মাথা ঘামাত না। আমাদের এক ব্রাহ্মণ মহারাজ ছিল, তার বউ বলত, "হম সব জোয়ান থী, তব ত ও বাচ্চা থা।" আবার উল্টোদিকে অনেক জাতের ছেলেদের কনের পণ জোগাড় করতে করতে বয়স অর্ধেক কেটে যেত। তারপর অনেক টাকা দিয়ে ছোট্ট একটি বউ আসত। ওদেশে কোন কোন জাতে মেয়ে বড় কম ছিল। অনেক মানুষ বউ জোটাবার মত টাকা সারা জীবনে সংগ্রহ করে উঠতে পারত না। নীচু জাতের মধ্যে পঞ্চায়েতের সাহায্যে divorceও হতে দেখেছি। শুধু পুরুষরাই করত না, মেয়েরাও করত। মুসলমানদের নিকার বিয়ের মত এদের নিম্নশ্রেণীতে একরকম বিবাহ ছিল, তাকে বলে 'বৈঠায় লিয়া'। বিধবা কিংবা স্বামী পরিত্যক্তাদের মধ্যেই বোধহয় এটা হত। পরে পঞ্চায়েৎকে ডেকে খাইয়ে সে বিবাহটা শুদ্ধ করে নেওয়া হত।

এলাহাবাদের প্রধান উৎসব ছিল পূজার সময় রামলীলা। ছোট ছোট ছেলেদের রাম লক্ষ্মণ সীতা হনুমান ইত্যাদি সাজানো হত। তারপর বড় বড় চৌকিতে ট্যাব-লোর মত করে তাদের দাঁড় করিয়ে উপরে চাঁদোয়া দিয়ে রাস্তায় মিছিল করে নিয়ে যাওয়া হত। উঃ সে কী ভীড়। রাস্তার দুইধারে পথে এবং সব বাড়ার ছাদে বারান্দায় লোকে লোকারণ্য। কোন কোন রাম-লক্ষ্মণ হাতী চড়েও আসতেন। দু-ধারে ভীড়ের লোকেরা জয়ধ্বনি করত আর অনবরত ফুলের তোড়া ছুঁড়ত। রাম-লক্ষ্মণের পিছনে উপবিষ্ট চেলারা ছড়ি দিয়ে ফুলগুলো ফেলে দিত যাতে দেবতা-দের গায়ে না লাগে। মিছিলের শেষ হত যে মাঠে সেখানে রাম-রাবণের যুদ্ধ

হয়ে একদিন রাবণকে দগ্ধ করে রামলীলা শেষ হত। দর্শকরা 'রাওনওয়া মর গিয়া' বলে উত্তেজিত হয়ে চেঁচাত। রাবণ ছিল বিরাট কাঠ-খড় ও কাগজের মূর্তি। আমরা অন্য বহু দর্শকদের সঙ্গে বামনদাস বসুদের বাড়ীতে বসে মিছিল দেখতাম, আর জিলিপি খেতাম। ওদের বাড়ীর মেয়েদের এত লোকের সেবা করতে হয়রান হতে হত।

কালীপুজোর সময় বড়লোকদের বাড়ীর দেওয়ালির আলো দেখতে লোকে ভীড় করে যেত, আমরাও গিয়েছি। হোলির উৎসবটা ছিল অভদ্র। গালাগালি অসভ্যতা অনেককিছু ছিল তার সঙ্গে জড়িত। 'পবিত্র হোলি'র চলন করবার জন্য একদল সংস্কারক চেষ্টা করতেন। মালবীয়জি তার মধ্যে একজন।

এলাহাবাদে বাঙালী সম্মিলনীর প্রধান উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন বাবা। সেখানে বক্তৃতা, গান, আবৃত্তি ত হতই, তার উপর লাঠি খেলা, তলোয়ার খেলা, tent pegging, হাইজম্প, লং জম্প, কত কী খেলা হত। বড় বড় গোঁফ কামানো ছেলেরা under 16 লিখিয়ে এইসব খেলায় ঢুকে পড়ত। গান শোনাবার জন্য বাবা কলকাতার কুন্তলীন প্রেসের এইচ. বসুর কাছ থেকে ফনোগ্রাফ আনিয়েছিলেন। বাজাবার জন্য একজন লোকও সঙ্গে ছিলেন। তখনকার রেকর্ড ছিল গেলাসের মত দেখতে, থালার মত নয়। এই প্রথম কলের সাহায্যে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠের গান শুনলাম। "অয়ি ভুবন মনোমোহিনী", "আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি"। এসব গান তার আগে এলাহাবাদে কেউ শোনেনি। কোন কোন রেকর্ড ছিল সুবিখ্যাত গায়িকা অমলা দাশের। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "পার ত জন্মো না কেউ বিষ্যুৎবারের বারবেলায়" ও "বুড়োবুড়ী দু-জনাতে মনের মিলে সুখে থাকত, বুড়ো ছিলো পরম বৈষ্ণব বুড়ী ছিল ভারি শাক্ত" এইসব হাসির গান আমরা দু-দিনেই শিখে নিলাম। কী মজা লাগত সেইসব গান গাইতে। বাজিয়ে ভদ্রলোক আমাদের বাড়ীতেই ছিলেন, যখন তখন নানা রেকর্ড বাজিয়ে আমাদের খুশি করতেন।

তারপর এল বঙ্গভঙ্গ। বাংলাদেশে তখন সভাসমিতি পুলিশের গুঁতো, ধরপাকড়, বিলিতি কাপড় পোড়ান, স্বদেশী কাপড় ফিরি করা, কতরকম উত্তেজনা। আমরা বাইরে থাকলেও একেবারে নীরব ছিলাম না। এলাহাবাদেও সভা, মিছিল, রাখীবন্ধন সব হত। আমি তখন শাড়ী পরেছি ছোট হলেও, কাজেই আমাকে পর্দানশীন করা হয়েছিল। মা বলতেন, "ও দেখতে বড় হয়ে গিয়েছে।" সীতা পায়জামা আর পাঞ্জাবী পরে মিছিলের সঙ্গে বেরিয়ে যেত। সভাতে আমরা সবাই চিকের আড়ালে বস-

তাম। একটা সভায় সুলেখক নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতি অনেকে বক্তৃতা করেছিলেন। নগেন্দ্রবাবু বোধহয় মহিলাদের শ্রুতিসুখকর হবে মনে করে বক্তৃতা আরম্ভ করলেন মেয়েলি ভাষায়, "যখন কোন ভাগ্যবতী বেটার বিয়ে দিয়ে বৌ ঘরে তোলেন···" ইত্যাদি বলে। চিকের আড়াল থেকে একজন মহিলা মন্তব্য করলেন, 'আ মর মিন্‌সে'; এদিকে একটা ছোট মেয়ে আমার পাশে বসে ক্রমাগত আমার চুল ধরে টান দিচ্ছিল। আমি যতই সরে বসি, সে ততই এগিয়ে আসে। সীতা ছিল আমার রক্ষয়িত্রী, সে দিল মেয়েটাকে ঠাস্ করে একটা চড়। মেয়েটা একদম চুপ। কাজেই সভাতে স্বদেশী বক্তৃতার উপর আরও অনেক কিছু হত।

রাখীবন্ধনের দিন আমরা অরন্ধন করলাম। বাবা কোথা থেকে লাল রেশমের সুতো আর হল্‌দে চরকার সুতো নিয়ে এলেন। লাল থোপা দিয়ে দিয়ে আমরা হলদে সুতোর রাখী তৈরী করলাম। কত লোককেই যে বাবা ডাকে রাখী পাঠালেন তার ঠিক নেই। কলকাতায় এসেও এই নিয়মটা আমরা কিছুদিন পালন করে-ছিলাম।

কলেজের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতে না মেলাতে বাবা ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রিন্সিপ্যালের কাজ ছেড়ে দিলেন। তখন বাংলা 'প্রবাসী' এবং ১৯০৭-এ নব প্রকাশিত ইংরেজী 'মডার্ন রিভিয়ু' নিয়েই বাবা কাজে লাগলেন। তাঁর সহায় হলেন ইণ্ডিয়ান প্রেসের চিন্তামণি ঘোষ মহাশয়। এসব কথা বাবার জীবনীতে আমি আগেই লিখেছি।

আমাদের বড়মামার বাঁকুড়াতে পড়াশোনা ভাল হচ্ছিল না। তাই মা তাঁকে এলাহাবাদে আমাদের সঙ্গে নিয়ে এলেন। বাড়ীতে আরেকজন মানুষ বাড়ল। বড়-মামা পরে 'প্রবাসী'র কাজে লেগে গেলেন। পাড়ার ছেলেরা তাঁকে মাতুল বলে ডাকত। ও দেশের ছেলেরা মাতুল কথার অর্থ সবাই জানত না; অনেকে তাই বলত 'মাতুলবাবু'।

এলাহাবাদে আমাদের বিশনদাদাও কিছুদিন ছিলেন। একবার মাসিমা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হ্যাঁরে, সিপাহী বিদ্রোহ কোন বছর হয়?" তাই শুনে আমাদের ঝিয়ের বৃদ্ধা মা বললে, "উ তো বাচ্চা হ্যয়। ক্যা জান্‌তা? হম্‌সে পুঁছো।" সে মিউটিনি দেখেছিল।

সাহেবপাড়ার বাড়ীগুলোর পরে এবং মেঘরাজের বাড়ীর পর আমরা এলাম দেশীপাড়ায়, তার নাম কোঠা পার্চা। বাড়ীর মালিক ফুলমণি ধাত্রী। অনেকগুলো ঘর, দুটো উঠোন, চাকরদের জন্ত আলাদা একটা কাঁচা ইটের মহল, কিন্তু সাহেব-পাড়ার বাড়ীর মত মস্ত বড় বা ছোট্ট কম্পাউণ্ডও নেই। এখানে সারাক্ষণই বাড়ীর

মধ্যে থাকতে হয়। আমাদের অনভ্যস্ত মন ছট্‌ফট্ করত। পিছনের প্রতিবেশীরা একেবারে বস্তিবাসী আর সামনে রাস্তার ওপারে পাণ্ডাদের আড্ডা। তারা যাত্রী দেখলেই সদলে সরবে চীৎকার করে, "গঙ্গা বিষ্ণু ছোটেলাল গয়াজীকা পাণ্ডা।" রাত্রে শীত গ্রীষ্ম সব সময়ে তারা খোলা বারান্দায় শুয়ে ঘুমোয়, শীতের সময় নাক মুখ চোখও লেপে মুড়ি দিয়ে থাকে। ভালো ভালো লক্ষ্ণৌ ছিটের লেপ।

প্রথম এলাহাবাদ এসে চারুবাবু এই বাড়ীতে ওঠেন। এখানে বাড়ী বাড়ী বোধহয় কল ছিল না, তাই গরীব বাসিন্দারা আমাদের বাড়ীর সামনে রাস্তার কলে সারাদিন জল ভরত আর বাসন ধুত, যেমন আমাদের কলকাতাতেও ধোয়। গল্প-গাছা ঝগড়া সবই সঙ্গে সঙ্গে চলত। একজন শুচিবায়ুগ্রস্তা মেয়ে ছিল, সে প্রত্যহ তার ঘড়াটা বার কুড়ি-পঁচিশ ধুয়েও তৃপ্ত হত না। আর সকলের মুখগুলো এখন ভুলে গেছি, কিন্তু তাকে আজও মনে আছে।

গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড গরম হাওয়া বইত দুপুরবেলা, ঠিক যেন আগুনের হল্‌কা, তাকে বলত 'লু'। বাড়ীর সব দরজা জানালা বন্ধ করে দিয়ে মা একটু ঘুমোতেন। আমরা বড় আর একটা ঘরে বন্ধ থাকতাম, সে ঘরটা রাস্তার ধারে। মা শুতে যাবার পরই একটা লেমনেডওয়ালা রাস্তার ধারে এসে ক্রমাগত তার গাড়ী ঘড়ঘড় করত। আমার ভ্রাতারা রাস্তার দিকের দরজাটা খুলে তার কাছ থেকে সবাই লেমনেড নিয়ে খেত। তারপর বিকেলবেলা সে এসে মায়ের কাছে পয়সা চাইত। বকুনি খেলে হয়ত দু-চারদিন লেমনেড খাওয়া বন্ধ থাকত, কিন্তু তারপর আবার যে কে সেই।

গরমের সময় রাত্রে আমরা বাইরে শুতাম, অর্থাৎ উঠোনে। বৃষ্টি এলে উঠে পড়ি কি মরি করে খাটবিছানা তুলে ঘরে ঢুকতে হত। আমার কিন্তু গায়ে বৃষ্টি পড়-লেও ঘুম ভাঙত না, বাবা আমাকে ঘুমন্ত কোলে তুলে ঘরে শুইয়ে দিতেন। আমার তখন বছর বারো বয়স। আরো ছোটবেলা আরো ঘুমোতাম। যখন সিভিল-লাই-ন্সে ছিলাম তখন ত বাড়ীর উঠোন ছিল না, খোলা কম্পাউণ্ডেই বাইরে শুতে হত। এতে অনেকের অনেকরকম বিপদও হত। এক বাড়ীর মেয়েদের চোরে নাক কান ছিঁড়ে গহনা নিয়ে পালিয়েছিল।

এলাহাবাদে তখনকার কালে খুব প্লেগ হত। অনেকে শহর ছেড়ে পালাত। বাবা কখনই বোধহয় পালাননি। দুই-একবার আমাদের দেশে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। মেসোমশায় ত প্লেগ-রোগীর সেবাও করতেন। আমরা প্রায় সব বছরই ওখানে থাকতাম। কিন্তু একবার আমাদের বাড়ীতেই ইঁদুর মরতে শুরু করল দেখে বাবা তৎক্ষণাৎ ঠিক করলেন এখানে ছেলেমেয়েদের আর রাখা চলবে না। সোবাতিয়া

বাগ নামে একটা জায়গায় হেল্‌থ ক্যাম্প হয়েছিল। আমরা সেখানে চলে গেলাম। সেখানের কুঁড়েঘরগুলি অড়র গাছের বেড়ার, চাল খড়ের। ঝড়ে আগুনে বা গরু ও মানুষের অত্যাচারে যে কোন মুহূর্তেই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এইরকম আকস্মিক দুর্ঘটনা হতও। আমরা কিন্তু আনন্দেই ছিলাম। অন্য একটা এইরকম কুঁড়েঘরে নেপাল-বাবুরা সপরিবারে ছিলেন। সেখানে তাঁর শাশুড়ী সারাদিন ধরে নানারকম রান্না করতেন এবং তানুতুন নামে একটি ভাইপো মাঝে মাঝে খেলাচ্ছলে মাছ ধরে এনে আমাদের রান্নাঘরে দিয়ে যেত। নেপালবাবুর ভাগ্নে ও ভাইপো দু-জন ছিল, নামটা ভুল করলাম কিনা জানি না। ছেলেটি নিজেদের বাড়ীতে অর্থাৎ কুটীরে মাছ নিয়ে গেলে বোধহয় বকুনির ভয় ছিল। নেপালবাবু ছোট ছেলেদের ঐ জাতীয় খেলা পছন্দ করতেন না। সোবাতিয়া বাগে বড় বড় চুরির খবরও প্রায়ই পাওয়া যেত। তাই বড় ছেলেরা রাত্রে পাহারা দেবার পালা করেছিল।

বাবাকে ইংরেজ সরকার মোটেই ভাল চোখে দেখতেন না। 'মডার্ন রিভিয়ু' প্রকাশিত হবার পর থেকে তাঁদের রাগ আরও বেড়ে গেল। কোন প্রকারে তাঁকে এলাহাবাদ থেকে তাড়াতে পারলে তারা বাঁচে। স্বদেশীর সময় নেপালবাবুর চাকরী গেল, স্বদেশী সভায় যোগ দেওয়ার জন্য। হিউয়েট সাহেব কয়েকজন বাঙালীকে দণ্ড দিয়ে বাঙালী সমাজে ভীতি উৎপাদন করার চেষ্টা করেন। নেপালবাবু লিখেছিলেন, "বলা বাহুল্য, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ই ছিলেন হিউয়েট দণ্ডনীতির প্রধান লক্ষ্য।"

১৯০৮-এ বাবার লেখায় কি একটা ছিদ্র পেয়ে সরকার পক্ষ হুকুম করলেন, হয় 'মডার্ন রিভিয়ু' বন্ধ করতে হবে, নয় সম্পাদককে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এলাহাবাদ ছেড়ে যেতে হবে।

বাবা তাঁর বহু সুখদুঃখের স্মৃতিজড়িত এত দিনের প্রিয় কর্মভূমিকে ছেড়ে সপরিবারে কলকাতায় ফিরে এলেন। আগে এলেন বাবা, আমরা সবাই দাদার এণ্ট্রান্স পরীক্ষার পর ফিরলাম। সম্ভবত দাদা সকলের পরে এলেন।

আমরা এলাহাবাদ ছেড়ে আসাতে ভৃত্যমহলে মহা দুঃখ দেখা দিল। গোয়ালিনী বললে, "মাজী, যদি নৈনী (এলাহাবাদের পরের স্টেশন) তক যেতেন তাহলে আমি দুধ দিয়ে আসতাম। কিন্তু কলকত্তা ত যেতে পারব না।" আমাদেরও দুঃখের সীমা ছিল না। এর চোদ্দ-পনের বৎসর পরে আমাদের পুরাতন পাচক গণেশ মহারাজ 'খোঁখীরাণী'কে অর্থাৎ আমাকে দেখতে কলকাতায় একবার আমাদের বাড়ী এসে-ছিল।

মাতাভিখ্ বলে বাবার এক ভৃত্য ছিল। সে যদি বেঁচে থাকত, হয়ত সে-ও

আসত। সে বাবাকে খুব ভক্তি করত। বাবা যদি চটি পায়ে কখনও পথে বেরোতেন, অমনি সে জুতোজোড়া নিয়ে বাবার পিছন পিছন দৌড়ত। সে আবার ইংরেজীও বলত, কারণ সে ট্রিনিডাডে গিয়েছিল। সময় জানতে হলেই বলত, "হোয়াটো কি-লাক ?"

বাবা কায়স্থ কলেজ ছেড়ে দেওয়াতে অধ্যাপক ও ছাত্ররা সকলেই গভীর দুঃখ পেয়েছিলেন। বাবা ইংরেজী কাগজ চালাবেন শুনে পণ্ডিত বালকৃষ্ণ ত চটেই আগুন; বললেন, "রামানন্দ ত বৌরা (পাগল) হো গয়া।" কলেজের অধিকাংশ ছাত্রই ছিল হিন্দুস্থানী। তবু তারা এই স্বল্পভাষী বাঙালী অধ্যাপককে বিদায় দিতে হবে জেনে অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিল। বিদায়-দিনের অপরাহ্নে কলেজে বিদায়-উৎসব হয়। তারপর নূতন ও পুরাতন সমস্ত ছাত্ররা সভা ভেঙে অধ্যাপককে গাড়ীতে বসিয়ে সেই গাড়ী নিজেরা টানতে টানতে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে এল। বাড়ীর সামনের রাস্তা, পথের ধারের বারান্দা সব ছাত্রের ভীড়ে ঠাসাঠাসি। শেষ প্রণাম জানাতে এক-একজন করে ছাত্র তাঁর পায়ে মাথা পেতে দু-হাতে হাঁটু জড়িয়ে আর উঠতেই চায় না। সে দৃশ্য যারা দেখেছে, তারা চোখের জল সামলাতে পারেনি। এমনি করে কত রাত হয়ে গেল, কিন্তু বিদায়পর্ব যেন শেষ হতে চায় না।

আমরা আমাদের আসবাব সবই বোধহয় বামনদাসবাবুদের বাড়ীতে রেখে বাক্স-প্যাঁটরা এবং বইয়ের বোঝা নিয়ে কলকাতায় ফিরলাম। এলাহাবাদে যাঁদের সঙ্গে এতকাল এক পরিবারের মত কাটিয়েছিলাম, তাঁদের সকলকেই ছেড়ে চলে আসতে হল। মনে হল নির্বাসনে যাচ্ছি।

মুনু তার 'ডাকালবাবু' বামনদাসবাবুকে ছাড়া কোন ডাক্তারকে পছন্দ করত না। তিনি ওকে 'মুনুবাবু, আপনি' বলে কথা বলতেন। সেইটিই ছিল তাঁর রীতি। কাউকেই 'তুমি' বলতেন না। কলকাতার রীতি সব আলাদা দেখে বেচারী মর্মাহত হল।

আমরা এলাহাবাদ ছেড়ে চলে আসার পর ইন্দুভূষণ কিছুদিন বাদে এলাহাবাদ ত্যাগ করেন। পরে প্লেগ রোগে তাঁর মৃত্যু হয়। চারুবাবু কিছুদিন পরে কলকাতায় ইণ্ডিয়ান প্রেসের কাজেই আসেন। শেষ পর্যন্ত তিনি হন 'প্রবাসী'র সহকারী সম্পাদক। নেপালবাবু ওকালতির ইচ্ছা ত্যাগ করে শান্তিনিকেতনে শিক্ষক হয়েই জীবন কাটান।

দাদা আমি ও সীতা কলকাতাতেই জন্মেছিলাম। তারপর শিশুকালেই কলকাতা ছেড়ে এলাহাবাদে চলে যাই। আবার ১১।১২ বৎসর পরে সেই কলকাতাতেই

ফিরে এলাম, তবে অন্য পাড়ায়। দেখলাম বাবা মা এ পাড়াতেও অনেককেই চেনেন, আমরা প্রায় কাউকেই চিনি না। এলাহাবাদের গেট দেওয়া লন সমেত বড় বড় একতলা বাংলো বাড়ীর পর এখানের ছোট্ট তিনতলা বাড়ী কেমন যেন খেলাঘরের মত লাগল। একটা বাড়ীর সঙ্গে আর একটা বাড়ীর যেন গলাগলি ভাব, মাঝখানে এক তিলও ফাঁক নেই। দেখি আমাদের তিনতলা বাড়ীর পাশেই সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের চারতলা বাড়ী, বারান্দার রেলিং ছাড়া দুটো বাড়ীর মধ্যে আর কিছু আড়াল নেই; অন্য আর এক দিকেও রেলিংয়ের পরেই আর একটা ভাড়া বাড়ী। কেবল দুটো দিক একটু ফাঁকা—দক্ষিণদিকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রাঙ্গণ, যাকে আমরা মাঠ বলতাম। আর একদিকে আড়াই হাত চওড়া একটা গলি, পিছনের বাড়ীগুলিতে যাবার জন্যে। কোন বাড়ীতেই ২।১ হাতের বেশী উঠোন নেই, কিছু নেই, গাছপালার ত চিহ্নই নেই, কেবল কোনরকমে দিন ও রাত্রি যাপনের ব্যবস্থাগুলি ঠাসাঠাসি করে সাজানো। এরকম বাড়ীতে আমরা কখনও থাকিনি। আমাদের বাড়ী ছিল সব মাঠ বাগান ক্ষেতের মধ্যে এক একটা বড় বড় আস্তানা। আম, পেয়ারা, সজনে কতরকম গাছ। এখানে সমাজপাড়ার প্রাঙ্গণে দুটি সুপারি গাছ ও একটি কদম গাছ। বোধহয় একটি বেল গাছও ছিল। অতি শৈশবে শুনেছি হেরম্ব-বাবুরা কাছের কোন বাড়ীতে থাকতেন। আমার সে সব কিছু মনে নেই। হেরম্ববাবু চাকরকে মেরেছিলেন বলে শৈশবে তাঁকে আমি 'ধপধঁাইবাবু' বলতাম।

এখানে চাকরবাকর সব অন্যরকম, বাড়ীতে প্রায় কেউ থাকে না, অধিকাংশই ঠিকে ঝি। তারা শরৎচন্দ্রের ভাষায় 'combined hand', রান্নাও করে, সংসারের অন্য কাজও করে এবং থেকে থেকে কামাই করে। তাদের পরনে মাত্র এক ফের কাপড়, গায়ে জামা নেই। এলাহাবাদের দরিদ্রতম ঝি-ও দু-পাট করে বারো হাত শাড়ী পরত এবং গায়ে সর্বদা তাদের জামা আঙিয়া থাকত। ছোট কাপড় পরার চেয়ে তালি বা জোড়া কাপড় পরতেও তাদের কোন আপত্তি ছিল না।

আমাদের সঙ্গে সঙ্গে 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিয়ু'র আপিস এসেছিল, কাজেই আমাদের ঝি-এর উপর একটা দরোয়ান আর একটা চাকর রাখতে হল। ঠিকে বামুনঠাকরুণ রান্নার ভার নিল, এলাহাবাদের মত আর মহারাজ নয়। এই বামুন-ঠাকরুণের নাম সদী বামনী। সে আমাদের শৈশবেও মা-র কাজ করেছিল। তখন মায়ের একটি শিশুকে সে ডাকত 'রূপসুন্দর' বলে।

ভোর না হতেই প্রত্যেক বাড়ীর প্রত্যেক তলায় অথবা প্রত্যেক ঘরের আলাদা আলাদা গৃহস্থের আলাদা আলাদা উনোনে ঘুঁটে ও কয়লার ধোঁয়া চোখগুলো প্রায়

অন্ধ করে দিত। এলাহাবাদে আমাদের রান্না হত কাঠের জ্বালে। কাঠ ধরানো অনেক সহজ ছিল, এত ধোঁওয়াও হত না। ভাল করে কাঠ সাজাতে পারলে আর ফুঁ দেবার একটা লম্বা চোঙ্গা থাকলে বেশী গোলমালে পড়বার ভয় ছিল না। যাই হোক এখানের কয়লার উনোনেও আমরা এলাহাবাদের মত সকালে গরম গরম লুচি খেতাম, চা পাউরুটি নয়। আটা মাখা ও লুচি বেলা ছিল আমার কাজ। উনোন ধরানোর পর দুধ নেওয়ার পালা। দুধ এখানে আনত শিবপুর ডেয়ারীর গোয়ালা; তারা মস্ত বড় গরু দরজায় দাঁড় করিয়ে দুধ দোয়াত না, টিনে ভর্তি দুধ বাড়ীতে বাড়ীতে মেপে দিয়ে যেত। আমাদের বাড়ীটা সবটাই আমাদের ছিল, অন্য অধিকাংশ বাড়ীতে একখানা বা দুখানা ঘর নিয়ে আলাদা আলাদা ভাড়াটের বাসা। এইসব বাড়ীতে প্রত্যেকের একটা খোপের মত রান্নার জায়গা থাকত বটে; কিন্তু স্নান করবার ঘর প্রতি পরিবারের আলাদা ছিল না। এইজন্য ঝগড়াঝাটিও বাধত কারুর কারুর মধ্যে।

সমাজপাড়ায় ছিল অনেকগুলি মেয়ে, এত কাছাকাছি বাস এবং সন্ধ্যায় সবাই প্রাঙ্গণে বেড়ায়, কাজেই শীঘ্র তাদের সঙ্গে ভাব হয়ে গেল। তাদের একদল পড়ে বেথুনে আর একদল ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ে। এর মধ্যে ২।৪টি ছোট মেয়ে পাড়ার কাছেই চার আনার ইস্কুলে ঝিদের সঙ্গে হেঁটে যেত। যারা ২ টাকার ইস্কুলে পড়ত তারা স্বভাবতই চার আনার ইস্কুলকে ধর্তব্যের মধ্যে মনে করত না। সে সব খুবই ছোট স্কুল। বেথুন কলেজের জোড়া ঘোড়ায় টানা মস্ত বড় বাস আসত, পাদানে উর্দিপরা সহিস দাঁড়িয়ে। তারা গাড়ী দাঁড়াতেই সদর্পে নেমে কর্নওয়ালিস স্ট্রীট ছেড়ে দৌড়ে গলির মধ্যে ঢুকে পড়ত, দরজায় দরজায় "গাড়ী আয়া বাবা" বলে হাঁক দিতে দিতে। ছোট মেজ বড় নানা মাপের ফ্রক পরা শাড়ী পরা মেয়েরা দুই হাতে বুকের উপর এক পাঁজা বইখাতা চেপে বেরিয়ে পড়ত, কারুর ব্যাগ ছিল না তখন। সবাই পায়ে জুতোও দিত না। স্নানের পর লম্বা চুল দুলিয়েই বড় মেয়েরাও কলেজ যেত, খোঁপা বা বিনুনি না করলে বকুনি খেতে হত না। ২।১ জন মাথার উপর একটা কালো ফিতে বাঁধত।

এই বেথুন কলেজের স্কুলেই গরমের ছুটির পর, হাফ ইয়ার্লি পরীক্ষার সময় বোধহয়, বাবা আমাদের দুই বোনকে একদিন ভর্তি করে দিলেন। হেডমাস্টার শ্যামাচরণ গুপ্ত মহাশয় বাবার পরিচিত ছিলেন। এলাহাবাদে আমাদের বাড়ীতে একবার অতিথিও হয়েছিলেন। পরীক্ষা কিছু করলেন না, কেবল কি কি বই পড়েছি জিজ্ঞাসা করলেন। বিশেষ কিছু ইতস্ততঃ না করে আমাকে প্রি-ম্যাট্রিক ও সীতাকে

আর দুই ক্লাশ নীচে ভর্তি করে নিলেন। আমাদের রেখে দিয়ে বাবা ম্লান মুখে বাড়ী ফিরে গেলেন, আমরাও কাতর মুখে ক্লাশে গিয়ে বসলাম, অচেনা মেয়েদের মধ্যে। ইতিপূর্বে স্কুলে ত কখন যাইনি, কাজেই বাবারও মন খারাপ আমাদেরও মন খারাপ। মস্ত বড় হল ঘর, মাঝখানে বেথুন সাহেবের ছোট একটি আবক্ষ মূর্তি; ঘর বড় বটে কিন্তু একটা ঘরেই ছয়টা ক্লাশ। সে কালের দিন ত, কাজেই ক্লাশও খুব বড় বড় নয়, আমাদের ক্লাশে মাত্র গুটি আষ্টেক মেয়ে; আজ তারা সবাই বেঁচে নেই, অর্ধেক ওপারে চলে গিয়েছেন।

আমি তখন ইতিহাস, ভূগোল, বীজগণিত, জ্যামিতি এসব কিছুই জানি না। মাস্টারমশায়রাও কিছুই বলে দেন না। তাঁরা ক্লাশে যতটা পড়া হয়ে গিয়েছে, নিয়মমত তারপর থেকেই পড়ান। হেডমাস্টারমশাই অঙ্ক কষাতেন, আমি একজন অর্বাচীন বসে আছি জেনেও, বোর্ডে বীজগণিতের বড় বড় অঙ্ক খস খস করে কষে যেতেন; তাঁর দ্রুত কষার ধরনটা খুব admire করতাম, কিন্তু এক বর্ণও বুঝতে পারতাম না। দেড় বৎসর পরে ম্যাট্রিক দিতে হবে, আজকালকার দিন হলে চারটে টিউটর রাখা হত। কিন্তু বাবা সে সব কিছুই করলেন না। অগত্যা নিজেই হাবুডুবু খেতে খেতে বই থেকে পাঠোদ্ধার করতে লাগলাম এবং সীতার অঙ্কের মাস্টারীও করতে হল। ছয় মাস পরে বাৎসরিক পরীক্ষা দিলাম, যা জানা হয়ে ওঠেনি, তা বাদই দিলাম। তবু ভালই পাশ করে গেলাম।

ক্ষুদু ব্রাহ্ম বয়েজ স্কুলে ভর্তি হলেন, মুলুকে বোধহয় স্কুলে দিয়ে আবার ছাড়িয়ে নেওয়া হল। তার বয়স তখন মাত্র পাঁচ এবং শরীর অত্যন্ত খারাপ। সে সারাদিন গান গেয়ে, ভাঙা ঘড়ির স্প্রিং দিয়ে সাবমেরিন বানিয়ে অবসরকাল নূতন বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করে বা ক্ষুদুর সঙ্গে ভাব ও ঝগড়া করে দিন কাটাতে লাগল। পড়াশুনাও অল্প চলত। পাশ করে এসে দাদা কলেজে ভর্তি হলেন। এলাহাবাদ থেকে একটা সোনার মেডেলও পেলেন।

ক্ষুদু ও মুলুর অনেক স্বরচিত হাস্যকর গান ছিল, তারা দু-জন সেগুলো গাইত; একটা ছিল 'ক্ষুদু মুলু কানমলা খায়', আর একটা ছিল কে কে বিড়ি খায় (অর্থাৎ সিগারেট খায়) ও তাদের নামের তালিকা। কানমলা অবশ্য ক্ষুদুরা কোনদিন খেত না, কারণ বাবা-মা ছেলেমেয়েদের কখনও মারতেন না। মা যদি ক্ষুদুকে বলতেন, "তোমার মা হব না" তাহলেই ক্ষুদুর সব দুষ্টুমি থেমে যেত। "অমুকবাবু বিঁড়ি খান—আমি বিঁড়ি খাই না। তমুকবাবু বিঁড়ি খান—আমি বিঁড়ি খাই না। অমুকবাবুর মেয়েগুলি সবাই বিঁড়ি খায়—আমি বিঁড়ি খাই না"—এই

ছিল ওদের দ্বিতীয় গান। বিড়ি খাওয়া ফর্দে যাঁদের নাম ছিল, তাঁদের নাম করলে বিপদ।

আমাদের সময় আমাদের ক্লাশে অন্তত সবাই প্রায় পুরুষ শিক্ষক ছিলেন। তাঁরা কেউ চোগা চাপকান পরতেন, কেউ ধুতি চাদর, কেউ বা বিলিতি স্যুট। প্রধানত নীচের ক্লাশের জন্য কয়েকজন মহিলা শিক্ষয়িত্রী ছিলেন; এঁরা প্রায় সকলেই পুরা লম্বা হাতের সাদা জামা আর সাদা শাড়ী পরতেন। ওরই মধ্যে সেলাইয়ের শিক্ষয়িত্রী নগেনদিদি লেস দেওয়া ছোট হাত পরে সুসজ্জিতা ফিটফাট হয়ে আসতেন। পোষাকে প্রথম নিয়ম ভঙ্গ করলেন জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী। তিনি ডুরে চৌখুপী রঙীন নানারকম শাড়ী পরেই আসতেন; অবশ্য তাঁর বয়সও খুব কম ছিল। বড় বড় গলার জামা পরতেন, কিন্তু নিজের মায়ের কাছে বকুনি খেতেন সে জন্য। জ্যোতির্ময়ীকে আমরা 'চামীদি' বলতাম। তাঁর মা ছিলেন ডাক্তার কাদম্বিনী গাঙ্গুলী, চন্দ্রমুখীর মত এদেশের প্রথম মহিলা গ্রাজুয়েট। চামীদি আমাদের ম্যাট্রিক ক্লাশে ইংরাজী পড়াতেন। আমাদের এক মাস্টারমশায় *England's Work in India* পড়াতেন; তিনি বই খুলে কেবলি underline করতে বলতেন; and, but, thus, so, ইত্যাদি কয়েকটা কথা ছাড়া সবই প্রায় underline করতে হত। ক্লাশের বাইরে আমরা যদি অন্য মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতাম, মাস্টারমশায় তিতিবিরক্ত হয়ে উঠতেন, 'সখিত্ব করা হচ্ছে, জিহ্বা লক্ লক্ করছে।' ক্লাশের ভিতর underline করা ছাড়া আর একটা কথা তিনি বারবার বলতেন, কিছু বুঝিয়ে দেবার পর "do 'stand না do 'stand ?"

দ্বারিকবাবু বলে একজন মাস্টার ছিলেন। সাদা চোগা চাপকান পরা, বেশ হাসিখুশি; তিনি বলতেন, "ইংরিজী যদি শিখতে চাও তো খবরের কাগজ পড়।" দুপুরে ঢং ঢং করে টিফিনের ঘণ্টা পড়লেই বোর্ডিংয়ে মেয়েরা মহোৎসাহে খেতে চলে যেত, আমরা শুকনো মুখে চাতালে ঘুরে বেড়াতাম। নীচের ক্লাশের অনেক মেয়েদের ঝি-চাকরেরা লুচি, তরকারি, দুধ নিয়ে আসত, মেয়েরা চাতালে উবু হয়ে বসে খেয়ে নিত। আমরা ঐভাবে খেতে লজ্জা পেতাম বলে কিছু খাওয়াই হত না। মাটির একটা বিরাট জালায় খাবার জল থাকত, যার দরকার সে ঝিয়ের কাছে জল চেয়ে নিত। একটা বাক্সওয়ালা আসত চকোলেট লজেন্স ইত্যাদি নিয়ে; কেউ কেউ তার কাছে ঐ সব কিনত। আমার মোটেই ভাল লাগত না। তারপর একদল মেয়ে ঝাঁক বেঁধে skip করতে শুরু করত, চুল দুলিয়ে দুলিয়ে; যে যতরকম কেরামতী জানে দেখাত। আমিও বিদ্যাটা অর্জন করিনি, তাছাড়া ঐ দলের চেয়ে আমরা ছিলাম একটু বড়।

আমাদের সংস্কৃত পড়াতেন এক বৃদ্ধ পণ্ডিতমশায়, ধপধপে সাদা ধুতি চাদর, পাঞ্জাবীও সেইরকম, ধপধপে সাদা জুতো পরতেন। তিনি কম কথাই বলতেন। কিন্তু কর্তব্য পালন করা যে প্রত্যেকের উচিত এ কথা প্রায়ই সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিতেন। তাঁর কাছে হিতোপদেশের 'মিত্রলাভ' 'সুহৃদ্‌ভেদ' ইত্যাদি পড়তে বেশ ভাল লাগত। বাংলা প্রচুর পড়েছিলাম বলে সংস্কৃত গদ্য বুঝতে কিছুই কষ্ট হত না। তাঁকে প্রণাম করলে পণ্ডিতমশায় বলতেন, "পুরুষদের পায়ে হাত দিয়ে মেয়েরা প্রণাম করে না।" পদ্যে রামায়ণ ও মহাভারতের গল্প অল্প পড়তে হত। "তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়" পড়ে পড়ে হয়রাণ হবার জোগাড়। রামায়ণের একটা লাইন মাঝে মাঝে এখনও মনে পড়ে, "জ্যোৎস্না তুষারমলিনা সীতেব চাতপশ্যামা।" আমাদের বৃদ্ধ পণ্ডিতমশায় পেনসান নিয়ে চলে যাবার পর এক নূতন পণ্ডিতমশায় এলেন, সাধারণ বাঙালীদের মতই আধময়লা কাপড়-চোপড় পরে।

সীতা ইংরেজী বেশ ভাল লিখত, কারণ ছোট্ট বয়স থেকে সে অনেক ইংরেজী বই ও ম্যাগাজিনে ডুবে থাকত। স্কুলে একদিন নূতন পণ্ডিতমশায় তাকে একটা সংস্কৃত গল্প ইংরেজীতে অনুবাদ করতে দিলেন। খাতাটা লেখা হলে দেখে বললেন, "তুমি বই থেকে কপি করেছ।" সীতা তো রেগে আগুন, গিয়ে হেডমাস্টারমশায়কে বলে দিল। তিনি বললেন, "নিজে লিখতে পারে না তাই ওরকম বলে। আমি তাকে বলব।"

আমাদের ড্রইংও শিখতে হত। এক মাস্টারমশায় ছিলেন, তিনি প্রত্যহ এসেই আমাদের srtaight line টানতে বলতেন। মাঝে মাঝে "মডেল ড্রইং কর", বলে বড় বড় কাঠের cube ইত্যাদি এনে টুলের ওপর রাখতেন। আর পেনসিলটা কি করে চোখের সামনে লম্বা করে ধরে মাপ ও angle বুঝতে হয় শেখাতেন। তাঁর কাছে আঁকতে কিছু শিখিনি। এরপর এক সুট পরা ফিটফাট ড্রইং মাস্টার এলেন। তিনি বেশ ভাল আঁকতে পারতেন। রঙীন ছবি আঁকতে দিয়ে নিজেই সযত্নে সবটা এঁকে দিতেন। তারপর আমাকে দিয়ে কালি-কলমে ছুটো বেড়াল আর হাতির ছবি আঁকালেন। আমি ছবি আঁকতে পারছি দেখে মহা খুশি হয়ে গেলাম। এর দশ বৎসর পরে নন্দলালবাবুর কাছে সত্যি আঁকা শিখি।

স্কুল ছুটির ঘণ্টা পড়লে যারা ফার্স্ট বাসে যাবে তারা হুড়মুড় করে কলরব করতে করতে সৈদু আর রহিমের গাড়ীতে উঠে পড়ত। বাবা বলতেন, "মানুষ গাড়ী চড়ে যায়, কিন্তু কোচম্যানকে কখনও দেখে না।" কথাটা সাধারণভাবে সত্য হলেও আমার আজ পর্যন্ত সৈয়দ আর রহিমকে মনে আছে, রোগা ফর্সা সৈদু আর মোটা

কালো পান খাওয়া রহিম। আমরা প্রায়ই দ্বিতীয় দফায় যেতাম, সুতরাং নির্জন স্কুলের বারান্দায় পাইচারি করা ছাড়া কাজ থাকত না। বাড়ীর জন্ত আর খাবার জন্ত মনটা ব্যস্ত হত। তবু বেথুন কলেজটা ভারি ভালো লাগত। সমাজপাড়ার মত গলির ভিতর গলি নয়। কেমন চওড়া রাস্তা, বড় বড় খেলার মাঠ, দূরে হেদো পুকুর, আর সবচেয়ে সুন্দর চমৎকার লম্বা লম্বা সারি সারি দেবদারু গাছ—সবুজ পাতায় ঝলমল করত।

বেথুন কলেজে বছরে একবার করে পুরাতন ছাত্রীদের সমাগম হত। তখন অনেক নামকরা বিদুষী মহিলার দর্শন লাভ করেছি। চন্দ্রমুখী বসু ছিলেন প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েট, তাঁকে একবারই মাত্র দেখেছি। পরে ইনি মোমগাই নামক এক-জন ভদ্রলোককে বিবাহ করেছিলেন। তাঁর কন্যা বাসন্তী মোমগাই বেথুনে পড়তেন আমাদের চেয়ে উপরে। ডাঃ কাদম্বিনী গাঙ্গুলীও প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েট। এঁদের কথাই কবি হেমচন্দ্র লিখেছিলেন :

"হরিণনয়না ওগো কাদম্বিনী বালা,
শুন চন্দ্রমুখী কৌমুদীর মালা।"

কাদম্বিনী ব্রহ্মসমাজের কন্যা ও বধূ বলে তাঁকে আমরা অনেকবারই দেখেছি। তিনি ব্রাহ্মসমাজের উৎসবাদিতেও আমাদের বাড়ীতে আসতেন। সমাজপাড়ার যে বাড়ীতে আমরা ছিলাম, সে বাড়ীতে কাদম্বিনী বহু পূর্বে ছিলেন শুনেছি। কাদ-ম্বিনী ভাল ডাক্তার ছিলেন এবং খুব কড়া কড়া কথা বলতেন, অপ্রিয় সত্য বলতে ভয় পেতেন না। নিজের ছেলেমেয়েদেরও বাদ দিতেন না। কবি প্রিয়ম্বদা দেবী-কেও বেথুন সম্মিলনীতে দেখেছি। শুভ্রবেশা সুন্দরী, কিন্তু তারই মধ্যে সুন্দর করে সাজতেন আর মিষ্টি মিষ্টি করে হেসে কথা বলতেন। তাঁর একমাত্র সন্তান তারা-কুমার অকালে মা ও দিদিমাকে রেখে চলে গিয়েছিল। তারই নামে বোধহয় ওঁর বাড়ীর নাম হয় "তারাবাস"। প্রিয়ম্বদা সহজেই মানুষের মন হরণ করতে পারতেন। তিনি সার্থক 'প্রিয়ম্বদা' ও মেয়েদের 'প্রিয়দি' ছিলেন। তাঁরা মা ও মেয়ে প্রসন্নময়ী ও প্রিয়ম্বদা অনেক সময়েই একসঙ্গে বেড়াতেন। দু-জনেই শুভ্রবেশা ও সুন্দরী, বয়সে বোধহয় বেশী তফাৎ ছিল না। স্যার রাজেন্দ্রের কন্যারাও বছরে একবার বেথুনে আসতেন। তাঁরা শাড়ী পরতেন, কিন্তু প্রসাধন খুব বিলিতী ভাবের। লেডি অবলা বসুও ছিলেন বেথুনের ছাত্রী। মনে হচ্ছে, তিনিও মাঝে মাঝে দেখা দিতেন ওখানে।

স্কুল থেকে আমরা যখন বাড়ী ফিরতাম প্রায় সন্ধ্যা হয়ে যেত। এসে এক তাঁড়

চিনিপাতা দই খেতাম, তার নাম ছিল প্রাণকৃষ্ণবাবুর দই, কারণ ডাঃ প্রাণকৃষ্ণবাবুর একতলাতে দইয়ের দোকানটা ছিল। দোকানের কেনা ঢাকাই পরোটা ছিল আমাদের একটা প্রিয় জলখাবার। তখন infection-কে ভয় পেতাম না। বাবা রাত জেগে পড়া পছন্দ করতেন না; কাজেই খাওয়া-দাওয়া পড়া-শুনা সেরে ন'টার মধ্যেই শোওয়া ছিল নিয়ম। শুয়ে শুয়ে দুই বোনের গল্পটা খুব জমৃত। কিন্তু বাবা আমাদের কণ্ঠস্বর বেশীক্ষণ শুনলেই বলতেন, "মাতারি রাত হয়েছে, ঘুমোও।" লণ্ঠনের আলোতে অল্প রাতকেই বেশী রাত মনে হত। অন্ধকার থাকত। আমরা গ্রীষ্মকালে অনেক সময় বারান্দায় মাদুর পেতে ঘুমোতাম। কারণ পাড়ায় চারপাশে মহলানবিশ মশায় ছাড়া কারুর বাড়ীতে বিজলী বাতি ছিল না; দূরে ডাঃ মৃগেন্দ্রলাল মিত্রের বাড়ীতেও বিজলী বাতি জ্বলত, বাড়ীর মেয়েদের ঘোরাফেরা দূর থেকেই দেখা যেত। তারা আমাদের চেয়ে বেশী রাত জাগত।

বেথুন স্কুলের মাইনে ছিল দু-টাকা মাত্র; বাস ভাড়া লাগত না। তবে নানা গলি ঘুরে ঘুরে মেয়ে তুলতে তুলতে ঘোড়াটানা বাস যেত, কাজেই অনেকটা সময় অকারণেই গাড়ীতে কাটত। বাবা-মা'র ব্যবসায় ভাল করে না জেনে বেথুনে মেয়ে নেওয়া নিয়ম ছিল না। কিন্তু মাঝে মাঝে ২।১টা ফাঁকি ধরা পড়ত না। আমাদের গাড়ীতে একটি সুসজ্জিতা মেয়ে আসত। সে একবার বলেছিল, "আমার মা কাল মুজরো করতে গিয়েছিল।" অনেকদিনের কথা ভাল মনে নেই, কিন্তু মনে হচ্ছে মেয়েটিকে নিয়ে গোলমাল হয়েছিল।

কলকাতার অনেক গলি আমাদের চেনা হয়ে গিয়েছিল। শিবনারায়ণ দাসের লেন ছিল ভীষণ নোংরা, এখানে চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় থাকতেন, তাঁর কন্যারা মাধবিকা ও স্থলতিকা ছিলেন বেথুনের ছাত্রী। মুক্তারামবাবু স্ট্রীট ছিল একটা গোলকধাঁধা, কত বাঁক ঘুরে যে গাড়ী যেত তার ঠিক নেই।

সেকালে স্কুলের মেয়েদের কোন ইউনিফর্ম ছিল না। আমরা প্রায়ই মিলের শাড়ী পরে ইস্কুলে যেতাম। অনেকে সবসময়ই তাঁতের শাড়ী পরে আসত, কিন্তু বেশীরভাগ সাদা। সেকালে দু-জন ব্রাহ্মমহিলা ছিলেন, তাঁরা পুঁটলি নিয়ে বাড়ী বাড়ী তাঁতের শাড়ী বিক্রী করতে যেতেন। আমরা কিনতাম কিছু কিছু। তাঁর ফরাসডাঙ্গার শাড়ী যাঁরা পরতেন, তাঁরা তাঁদের আভিজাত্য সম্বন্ধে একটু বেশী সচেতন ছিলেন। একজন মহিলাকে আমরা বামাদিদি বলতাম। তিনি শেষ সময়ে বেশ কিছু টাকা বোধহয় ব্রাহ্মসমাজে দান করে গিয়েছিলেন। এদের শাড়ীগুলি তাঁতের কিন্তু নানা রকমারি ছিল না। স্কুলে মেয়েরা নানারকম পোষাকেই আসত।

রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীর ছুটি ছোট ছোট মেয়ে আসত, ভারি সুন্দর দেখতে তারা। কিন্তু দু-জনের সাজসজ্জা দু-রকম। একটি মেয়ে মেমসাহেবের মত চুল কাটা, ফ্রক পরা, অন্যটির মাথায় খোঁপা, পায়ে মল, পরনে শাড়ী, দু-জনের বয়সই ৭।৮ হবে। আর-একজন দেশবিখ্যাত ভদ্রলোকের বাড়ীর ছুটি ছোট মেয়ে যেদিন প্রথম ভর্তি হল, সেদিন সুন্দর করে বড় খোঁপা বেঁধে ব্লাউজের উপর শুধু একখানা শাড়ী পরেই চলে এল। পরে মহিলা শিক্ষয়িত্রীরা বলে দিলেন শাড়ীর সঙ্গে পেটিকোট পরতে হবে। একজন ক্রীশ্চান শিক্ষয়িত্রী স্কার্ট ও ব্লাউজের উপর একটা আলাদা আঁচল কাঁধে ব্রচ দিয়ে আটকে পরতেন। এইরকম পোষাক ব্রাহ্ম-সমাজের একজন মহিলাও বিলাতে পরতেন, ছবিতে দেখেছি। আমরা যখন ম্যাট্রি-কুলেশন দিই, তখন একটি সুবিখ্যাত বাঙালী বাড়ীর মেয়েও এইরকম স্কার্ট ব্লাউজ ও আঁচল পরে পরীক্ষা দিতে আসতেন।

আমাদের যুগে নাম করা ছাত্রী ছিলেন তটিনী গুপ্ত। ইনি হেডমাস্টার শ্যামাচরণ গুপ্ত মহাশয়ের কন্যা। শুনতাম তটিনী পরীক্ষার সময় দিনে ১৮ ঘণ্টা পড়তেন। খাওয়া শোওয়া ইত্যাদির জন্য মাত্র ছয় ঘণ্টা হাতে থাকত। তটিনী ছাত্রী অবস্থায় অনেক সময়ই তাঁর মেসোমশায় ডাঃ নীলরতন সরকার মহাশয়ের বাড়ীতে থাকতেন। স্কুলে তিনি বোধহয় ইংরেজী ছাড়া আর সব বিষয়েই প্রথম হতেন, সীতা হতেন ইংরেজীতে প্রথম ঐ ক্লাশে। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় তটিনী ছেলেমেয়ে সকলের মধ্যে প্রথম হন। I. A., B. A., M. A.-তেও বোধহয় তাই। তাঁর কাছাকাছি হতেন সরোজকুমার দাস। সরোজকুমার দাসের সঙ্গে পরে তটিনীর বিবাহ হয়। তটিনী ছেলেবেলায় দুই-একটা মজার পাগলামিও করতেন। একবার মেয়েদের সঙ্গে বাজী রেখে এক শিশি কালী খেয়ে ফেলেছিলেন। আমাকে তিনি বরাবর ভালবাসতেন। শেষ সময়েও দেখা করতে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। আমি তখন সবে বিদেশ থেকে কলকাতায় ফিরেছি, তটিনীর অসুখের কথা ভাল জানতাম না।

আমাদের স্কুলের মেয়েরা শাস্তিও পেত নানারকম। সেকালে বেঞ্চের উপর উঠে দাঁড়ানো ছিল একরকম শাস্তি। অপরাধ যদি গুরুতর হত, তাহলে হলের মাঝখানে একটা টুল এনে সাতদিন সেই মেয়েটিকে পর পর ঐ টুলে দাঁড়াতে হত। এইভাবে দাঁড় করানো একবারই মাত্র দেখেছি। একবার একটি ম্যাট্রিক ক্লাশের মেয়েকে এক মাস্টার বেঞ্চের উপর দাঁড়াতে বলেছিলেন; তাতে সে অপমানিত হয়ে এমন ঝগড়া করেছিল যে মাস্টারই চুপ হয়ে গেলেন। ছোট মেয়েদের ভাগ্যে মাঝে মাঝে কান-মলাও জুটত। একজন শিক্ষয়িত্রী ছিলেন ভারি রাগী—কিন্তু পিটপিটে। তিনি

মেয়েদের কান মলবার সময় বোর্ডমোছা ঝাড়ন দিয়ে তাদের কান ধরতেন, পাছে তাঁর হাতে মেয়েদের কানের ময়লা লেগে যায়। ছোট মেয়েদের পড়া বলাবার সময় মাস্টাররা এক একজনের দিকে পেনসিল দেখিয়ে 'You' 'You' বলতেন আর তারা পড়া বলত। একদিন একটি মেয়ে একটু অন্যমনস্ক ছিল, 'you' বলামাত্র পড়া বলেনি। তার পাশের মেয়েটি সজোরে চেঁচিয়ে বললে, "এই you, পড়া বল।" মাস্টারমশায় চটে বেচারি পরোপকারী মেয়েটিকে বেঞ্চে দাঁড় করিয়ে দিলেন; কিন্তু সেকালের ছাত্রীরা এইসব শাস্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে শেখেনি।

কোন কোন ছোট মেয়ে ছিল কোন কোন বড় মেয়ের উপাসিকা। তারা ফুল, চকোলেট ইত্যাদি পূজার অর্ঘ্য নিয়ে আসত, উপাসিতা যদি হাসি মুখে গ্রহণ করতেন তাহলে উপাসিকার আ-কর্ণ লাল হয়ে উঠত আনন্দে ও লজ্জায়।

তখন বৈদ্যুতিক যুগ ছিল না বললেই চলে। স্কুল ও কলেজের ঘরে বড় বড় টানা পাখা টাঙানো থাকত, পাখা-কুলিরা সারা দুপুর পাখা টানত। বেচারীদের মাঝে মাঝে ঘুম পেত, তারা দড়ি ধরেই ঘুমিয়ে পড়ত। গরম লাগলে মাস্টার-মশায়রা হঠাৎ চেয়ার থেকে উঠে পড়ে পাখাটায় সজোরে একটা টান দিতেন। তার ধাক্কায় কুলি বেচারী হুমড়ি খেয়ে আবার উঠে পড়ে পাখা টানা শুরু করত।

প্রথম যে বৎসর ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা হয় সেই বৎসরই আমি পরীক্ষা দিয়েছিলাম। তার আগের বছর হয়েছিল এণ্ট্রান্স পরীক্ষা। বেথুনে সব পরীক্ষারই সেণ্টার ছিল। বাঙালী মেয়ে মেমসাহেব সবাই ওখানেই পরীক্ষা দিত। একবার লর্ড সত্যেন্দ্র-প্রসন্ন সিংহের কন্যা রমলা বা কমলা পরীক্ষা দিতে এসেছিলেন। আমার সঙ্গে পরীক্ষা দিয়েছিলেন লোরেটো থেকে ডাঃ সরকার মহাশয়ের কন্যা নলিনী ও ভাগিনেয়ী সুরীতি। পরীক্ষা দিতে যাবার দিন বাবা আমাকে একটা নূতন জরি-পেড়ে শাড়ী কিনে দিলেন। পরীক্ষা দিতে খুব ভয় পেয়েছিলাম, কিন্তু পরীক্ষা দিয়ে একটা স্কলারশিপও পেলাম। যদি আগে থেকে সব বিষয় পড়া অভ্যাস থাকত, হয়ত আর একটু উপরে স্থান পেতাম।

সে বৎসর আমাদের ইংরেজীর প্রধান পরীক্ষক ছিলেন ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, যিনি পরে গবর্নর হন। একদিন ডাঃ সরকার মহাশয়ের বাড়ীতে তাঁর সঙ্গে আলাপ হল। তিনি বললেন, "মন্দ লেখনি। তবে অত লম্বা Essay যদি না লিখতে তাহলে ভুল কম হত।" আমার মনে পড়ল স্কুলে প্রথম ভর্তি হওয়ার সময়ের কথা। গোড়ার দিকেই একদিন মাস্টারমশায় একটা বিষয় নির্বাচন করে বলেছিলেন,

"এই বিষয়ে একটা প্রবন্ধ লেখ।" আমি ভেবেই পেলাম না প্রবন্ধ আবার কী করে লিখতে হয়। অনেক ভেবে এক পাতা লিখে নিয়ে গিয়ে দেখালাম। মাস্টারমশায় খাতাটা হাতে করেই বললেন, "এত ছোট।" ঠিক করলাম, যা থাকে কপালে, এরপর বড় বড় প্রবন্ধ লিখব। কিন্তু ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের কথায় মনে হল বড় লিখলেই সব হয় না। মনটা খারাপ হয়ে গেল।

পরীক্ষার পর লম্বা ছুটি। ছুটিতে একটা নূতন আনন্দলাভ হল দার্জিলিং ভ্রমণে। পাহাড়ে কখনও আগে যাইনি। প্রথম দেখার রোমাঞ্চ আজও মনে আছে। পাহাড় পর্বত সমুদ্র পরে আরও অনেক দেখেছি, পুলকিতও হয়েছি, কিন্তু নবীন চোখে প্রথম দেখা জিনিসটাই আলাদা। ট্রেন থেকে নেমে এক জায়গায় বাক্স এবং কুলির ধাক্কা খেতে খেতে ষ্টিমারে চড়া, তারপর আবার সাড়া পার হলে, সিলিগুড়িতে খেলাঘরের ট্রেনে চড়া। কী সে ট্রেনের গতি! মনে হত হেঁটেও ত আমি ওর চেয়ে জোরে যেতে পারি। তাও কি ছাই, একটানা চলে? কতবার যে থামে, কেন যে থামে বোঝাই যায় না। একটা পাহাড় পাক দিয়ে যদি ওঠে, আর একটা পাক দিয়ে খানিকটা নেমে আসে। পায়ের কাছে বিশাল বিশাল মহীরুহের জঙ্গল দেখবার মত, মোটা মোটা লম্বা লম্বা গাছে ঠাসা। তার ভিতর দিয়েই কোথা থেকে মেয়েরা পিঠে ঝুড়ি ঝুলিয়ে হাসি হাসি মুখে ফুল ফল মালা কত কি বিক্রি করতে আসছে। এ বন বাংলাদেশের শালবনের মত ছবি ছবি মাজাঘসা দেখতে নয়, ভয়াবহ গম্ভীর দেখতে। মেয়েগুলি কিন্তু সুন্দর, কোমরে একটা শাড়ী, বুকের জামার উপর আর একটা চাদর বাঁধা, মাথায় তৃতীয় শাল কি চাদর, গলায় সিকি আধুলির মালা। একদল আবার সতরঞ্চি পরে মুখে খয়েরের ঘন প্রলেপ দিয়ে বেড়ায়; দুটো আলাদা জাত বেশ বোঝা যায়।

একটু উঁচুতে উঠতেই ঘোর গ্রীষ্মের দিনেও শীতের কাঁপুনি, থেকে থেকে ট্রেনের মধ্যে মেঘ ভেসে ঢুকে আসছে, আবার চলে যাচ্ছে। পথে বিপথে ফার্ন কতরকমের, ইচ্ছে করছে সব তুলে নিই। শিশুকালে আমার বড়জ্যাঠা মহাশয়ের কাছে এইরকম সব ফার্নের পাতা বইয়ের ভিতর প্রতি পৃষ্ঠায় সাজানো পেয়েছিলাম।

এমনি করেই দার্জিলিং পৌঁছলাম। সব আজ মনে নেই। মনে থাকলেও সব লিখতে গেলে দার্জিলিংয়ের কথাতেই খাতা ভরে যাবে। তবে পাহাড়ের মাথা কেটে যেখান থেকে পাগলাঝোরা নানা দিক দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে নেচে নেচে অসংখ্য জলধারায় ছুটে আসছে তাকে একেবারে উপেক্ষা করা চলে না। পাহাড়ে ঝরনার সফেন নৃত্য এই আমাদের প্রথম দেখা।

আমাদের জন্য লাসা ভিলার একটি ছোট কুটীর বা অংশ (ডেজি ব্যাঙ্কস) ভাড়া নেওয়া ছিল ; কিন্তু আমরা প্রথম গিয়ে উঠলাম হেমমাসিমার (হেমলতা সরকার) বাড়ীতে। তখনকার দিনে আমাদের এদিকে অনেকেই তাই উঠত। হেমমাসিমার ছোট মেয়েদুটি আমাদের পেয়ে যেন হাতে স্বর্গ পেল। কী আদর, কী যত্ন! আমরা যখন ডেজি ব্যাঙ্কে চলে গেলাম তখন হেমমাসিমার ছোট মেয়েদুটি রোজ সকাল-বিকালে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকত। আমরা কাছাকাছি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি দেখলেই তারা দৌড়ে এসে বাবার দুই হাত ধরে হিড় হিড় করে বাড়ীর মধ্যে টেনে নিয়ে যেত। কিছুতেই আর কোথাও যেতে দেবে না। আমাদের আগেই বাবা কিছুদিন ওদের বাড়ীতে এসে ছিলেন কিনা।

হেমমাসিমা দার্জিলিঙের অনেকরকম গল্প করতেন। ওদেশে তখন নাকি জিনিস বাইরে ফেলে রাখলেও কেউ চুরি করত না। পাহাড়ীরা চুরি করাকে ভয় করত। তাই আমাদের জিনিসপত্রের জন্য ভয় করতে বারণ করলেন। ওদেশের জাতিভেদের গল্পও করতেন। ওখানে ব্রাহ্মণরা অব্রাহ্মণের মেয়েকে বিয়ে করত বটে, কিন্তু সেই মেয়ের ছেলে বড় হলে আর নিজের মায়ের হাতে খেত না। এইরকম ব্রাহ্মণ পাচক একজন বোধহয় আমাদের জন্য ঠিক করা হয়েছিল। মাঝে মাঝে আমাদের সঙ্গে উনি ভুটিয়া মন্দির কিংবা ক্যালকাটা রোডে বেড়াতে যেতেন। ক্যালকাটা রোডের পাশে একটা বড় পাহাড় ধ্বসে পড়েছিল একবার। তখন কা করে "লি ফ্যামিলি" বাড়াসুদ্ধ সবাই মারা যান তার গল্প ওঁর কাছে শুনি। তাদেরই নামে কলকাতায় "লি মেমোরিয়াল" পরে হয়েছিল।

দার্জিলিং ব্রাহ্মসমাজ আগে বাজারের এত কাছে ছিল না বলতেন। ক্রমে বাজার এগিয়ে আসে। প্রতি রবিবার হেমমাসিমাই বেশীরভাগ উপাসনা করতেন। খাতায় লিখে আনতেন তাঁর উপদেশ। গান করতেন অনেকসময় স্বর্গীয় পি এন বসুর কন্যারা। ব্রাহ্ম নন এমন অনেক লোকই সমাজে আসতেন। হেমমাসিমা মহারাণী স্কুল নামে ওখানে বাঙালী মেয়েদের একটা স্কুল করেছিলেন।

তখন স্বদেশী সিল্কের নানারকম কাপড় বিশেষ পাওয়া যেত না। আমরা ছোট মেয়ে হলেও বাবা আমাদের পরবার জন্য তসর ও গরদের শাড়ী কিনে দিয়েছিলেন। যদি কখনও সুতার শাড়ী পরে বেরোতাম, হেমমাসিমা ভীষণ বকতেন, বলতেন, "লোকে তোমাদের আয়া মনে করবে।" তিনি নিজে সর্বদাই গরদের শাড়ী পরতেন বাইরে বেরোবার সময়।

ওখানে আমরা খুব বেড়াতাম বলে ভীষণ খিদে পেত। মা বাজার থেকে

আসবার পরই আমরা ক্রীত খাদ্যের মধ্যে যতটা তৎক্ষণাৎ খাওয়া যায় তা খেয়ে নিতাম। ভাত খাবার সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতাম না।

আমাদের বাড়ী থেকে উপরে অনেক উঁচুতে জলা পাহাড়ে গোরাদের ক্যাণ্টন-মেণ্ট দেখা যেত, বাজনাও শোনা যেত। গোরারা অনেকসময় কার্ট রোড পর্যন্ত নেমে আসত। তার চেয়ে নীচে বোধহয় তাদের যাওয়া বারণ ছিল। মেয়েদের বিরক্ত করা গোরাদের অভ্যাস ছিল। অনেকেই তাদের খুব ভয় করত। কার্ট রোড দিয়ে যেতে যেতে উপরের রাস্তা দিয়ে গোরা নামতে দেখলে আমরা নীচের রাস্তায় তাড়াতাড়ি চলে যেতাম; যতক্ষণ না গোরারা অদৃশ্য হত ততক্ষণ নীচেই দাঁড়িয়ে থাকতাম। একবার ওরা জনতিনেক দূর থেকে আমাদের রাস্তা আগলে ছিল, আমরা বুঝতে পেরে নীচের রাস্তায় একটা ভুটিয়ার ঘরের দরজায় গিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম।

কোন্ বছর মনে নেই, একবার হেমমাসিমার বাড়ীতে তাঁর বাবা শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় এসেছিলেন। আমরা তখন ওখানে। শাস্ত্রী মহাশয় মেসমেরাইজ করতে পারতেন। একবার করে দেখালেন। সব কথা মনে নেই, শুধু মনে আছে আমার চোখ বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। খানিক পরে শুনলাম সবাই হাততালি দিচ্ছে। আমার চোখ খুলে দেওয়া হল। আমি তখন পিয়ানোর সামনে গিয়ে বসে আছি। শাস্ত্রী মহাশয় আমাকে দিয়ে তাই করিয়েছিলেন।

ম্যালে বসে কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে তাকিয়ে থাকা অথবা পার্শ্বোপবিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে গল্প করা চেঞ্জারদের নিয়ম ছিল। আমরা কিন্তু বসে না থেকে খুব বেড়াতাম। বার্চ হিল, ঘুম নানা দিকে চলে যেতাম। দাদা ত হেঁটে কার্সিয়াংও যখন তখন চলে যেতেন। নীলরতনবাবুর সঙ্গে কোন একবছর আমরাও হেঁটে কার্সিয়াং গিয়েছিলাম। আমাদের মেজজ্যাঠামশায় দার্জিলিঙে জেলার ছিলেন। তাঁর বাড়ী অনেক নীচে, সেখানেও মাঝে মাঝে যেতাম। দেখতাম কয়েদীরা জেলের পোষাক পরে ও লোহার বালা পরে বাড়ীর মধ্যে কাজ করে বেড়াচ্ছে। ছোট শিশুদের কোলে নিয়েও বেড়াচ্ছে, কেউ তাদের ভয় করছে না।

দার্জিলিঙে কোন একবছর সীতার বেশ কিছুদিন ধরে জর হত। ডাঃ বিপিন-বিহারী সরকার মহাশয় দেখতেন। তিনি এসেই জিজ্ঞাসা করতেন, "কি খেতে ইচ্ছা করে?" সীতা বলত, "রসগোল্লা, আমের অম্বল" ইত্যাদি। ডাক্তার বলতেন, "সে ত হতে পারে না।" আবার সেই পুরাতন শাগু বার্লি, সীতা চটে যেত। ডাঃ নীলরতন সরকার মশায় তখন তাঁর Glen Eden-এর বাড়ীতে ছিলেন। একদিন তাঁর বৌদি

বেড়াতে এসে সীতাকে বললেন, "তুই একবার আমাদের ডাক্তারকে দেখা দেখি।" নীলরতনবাবুর ডাক পড়ল। সীতা আগের মতই আমের অম্বল খেতে চাইল। নীলরতনবাবু "আচ্ছা" বলে বাড়ী চলে গেলেন। খানিক পরে তাঁর বাড়ী থেকে একটা পাকা ল্যাংড়া আম এল। ডাক্তার বলে পাঠালেন, "এইটা দিয়ে অম্বল রেঁধে দেবেন।" সীতা ত মহা খুশি। নীলরতনবাবুর ছেলেরও সে সময় জর হয়েছিল। তাকে আমের অম্বল না দেওয়াতে সে বাবার উপর চটে গেল।

দার্জিলিং বেড়িয়ে কলকাতায় ফিরে এসে কলেজে ভর্তি হলাম। এবার আর দুই টাকা মাইনে নয়, তিন টাকা মাইনে। ঘরও আলাদা, মেয়ের সংখ্যাও বেশী। পূর্ববঙ্গের একদল মেয়ে ও অন্যান্য স্কুলের মেয়ে নিয়ে প্রায় জন পনের-কুড়ি মেয়ে হবে বোধহয়। বেশীরভাগ মেয়েই বোর্ডিঙে থাকত। আমরা কয়েকজন বাড়ী থেকে আসতাম। সত্যজিৎ রায়ের মা ঢাকা থেকে পাশ করে এখানে তাঁর মাসির বাড়ী থেকে পড়তেন। তাঁর ডাক নাম ছিল টুলু। ভাল গান করতেন, তাঁর ছোট বোন কনক ত বিখ্যাত গায়িকা। এঁদের মাতুল কুলের অনেকেই গায়ক-গায়িকা।

আমাদের কলেজে খুব ঘটা করে প্রাইজ হত, লাটসাহেব আসতেন, তাই লোকে লোকারণ্য হয়ে যেত। অবশ্য কার্ড না পেলে ঢোকা বারণ ছিল। বেথুনের কমিটিতে ঠাকুরবংশীয় একজন ছিলেন। তিনি প্রাইজের গানে সুন্দরী মেয়েদেরই শুধু নিতে চাইতেন। অথচ গায়িকা হলেই মানুষ সুন্দরী হয় না, কাজেই মহামুস্কিল বেধে যেত। বেথুন স্কুল থেকে প্রথম হয়ে পাশ করে অনেক প্রাইজ পাওয়া যেত। তাই আমার ত প্রাইজে প্রাইজে টেবিল বোঝাই হয়ে গেল। লর্ড কারমাইকেলের হাতে প্রাইজ ও অভিনন্দন পেলাম। অবশ্য এটা গবের বিষয় কিছুই নয়। লাটসাহেব হ্যাণ্ডসেক করলেন, সে কী মোটা হাত! ধরা যায় না, মনে হচ্ছিল বাঘের থাবা। টুলুর সঙ্গে লাটসাহেবের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল। তিনি বললেন, "তোমরা একসঙ্গে পড়? একজন ছোট্ট আর একজন মস্ত বড় কেন?" টুলু দেখতে বেশ লম্বা-চওড়া ছিলেন।

আমাদের বাল্যকালে ঝি রাঁধুনী ছাড়া অন্য মেয়েদের রাস্তায় হাঁটতে দেখতাম না, ট্রামেও প্রায় কোন মেয়ে চড়ত না। মেয়েরা স্কুলে যে বন্ধ বাসে যেত তার একটামাত্র জানালা খোলা। কোন কারণে গাড়ী অল্পক্ষণ পথে আটকে গেলে সেখানে পাড়ার ছেলেরা কৌতূহলে উন্মুখ হয়ে ভীড় করে দাঁড়াত। আমাদের সমাজপাড়া থেকে বেথুন কলেজ বেশী দূরে নয় অথচ ছুটির পর গাড়ী পাবার জন্য ঘণ্টা দুই স্কুলে বন্দী থাকতে হত। আমাদের পাড়ার অনেকগুলি মেয়ে বেথুনে

পড়ত। আমরা একদিন ঠিক করলাম সবাই মিলে হেঁটে বাড়ী ফিরব। আমাদের মধ্যে শান্তিময়ী দত্ত বোধহয় প্রধান ছিলেন। যাই হোক কলেজ স্কুল থেকে হেঁটে বাড়ী ফেরার বিষয়ে আমরা পথপ্রদর্শক বলে দাবী করতে পারি। সবাই মিলে বই খাতা নিয়ে রওনা হলাম। পথে বিস্মিত দর্শকেরা দাঁড়িয়ে গেল। কেউ কেউ আমাদের নাম ধরে ডাকতে লাগল। কি করে যে নাম জানল জানি না। কেউ-বা "একটা প্রার্থনা আছে" বলে কাছে এগিয়ে এল। এইসব উৎপাতের জন্য আমরা হেঁটে ফেরার মতলবটা বেশীদিন রক্ষা করতে পারিনি।

আমাদের ছেলেবেলায় থিয়েটার দেখা ব্রাহ্মসমাজে মহাপাপ বলে গণিত হত। তাই আমরা কখনও public theatre-এ অভিনয় দেখতে যাইনি। কিন্তু সমাজ-পাড়ায় আমাদের বাড়ীর প্রায় গায়ে ছিল "সঙ্গীত সমাজ"। সেখানে অনেক অভিনয় হত। ছেলেরাই মেয়েদের ভূমিকায় নামতেন। পাড়ার বিপিনবিহারী রায় মহাশয়ের ছাদ থেকে ওদের স্টেজটা স্পষ্ট দেখা যেত। আমরা পাড়ার অনেক মেয়েরা মিলে সেখানে বসে বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী' এবং বোধহয় দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাজাহান' অভিনয় দেখতাম রাত জেগে জেগে। দেখতে ভালই লাগত। তবে প্রেমাভিনয় হাস্যকর মনে হত। দিগ্বিজয় ও গিরিজায়া একটু অতিরিক্ত ঝগড়া করত।

সেকালে 'স্বদেশী' মেলা বলে একটা মেলা পান্তির মাঠে মাঝে মাঝে হত। একবার স্বদেশী মেলায় গিয়ে শুনি সেখানে গহরজান নাম্নী বাঈজি এসেছেন। কৃষ্ণ-কুমার মিত্র মহাশয় ছিলেন দারুণ কড়া ব্রাহ্ম। তাঁর মেয়েরা খবরটা শুনেই পড়ি কি মরি করে মেলা ছেড়ে পালালেন। অগত্যা আমরাও দৌড় দিলাম, কি জানি গহর-জানের দৃষ্টি লেগে যদি কোন পাপ হয়ে যায়।

এলাহাবাদেও কিন্তু আমরা মাসিমাদের বাড়ীর পাশের একটা বাঈনাচ লুকিয়ে লুকিয়ে দেখেছিলাম সিঁড়ি থেকে উঁকি মেরে। সেখানে audience সব পুরুষ মানুষ নর্তকী একলা স্ত্রীলোক।

আমরা যখন সমাজপাড়ায় আসি তখন সেখানে গুরুচরণ মহলানবিশ, বিপিন-বিহারী রায়, দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ এঁরা ছিলেন প্রাচীন বাসিন্দা। শাস্ত্রীমহাশয়ও থাকতেন, তাঁকে আলাদা ধরছি। প্রথম চারজনের ছিল নিজেদের বাড়ী। সাধনাশ্রমে নবদ্বীপচন্দ্র দাস, কাশীচন্দ্র ঘোষাল, বৃদ্ধ পণ্ডিতমশায় এবং কিছুদিন পরে গুরুদাস চক্রবর্তী প্রভৃতিও ছিলেন। এঁরা ব্রাহ্ম প্রচারক, তাই সাধনাশ্রমের বাড়ীতে থাকতেন। সাধনাশ্রমের একটা কাঠের দোতলা বাড়ীও ছিল। তাতে মহিলারা কেউ থাকতেন না। একলা পুরুষ মানুষ

দুই-একজন থাকতেন। পাড়ার অন্য সব বাড়ীতেই একাধিক পরিবার ভাড়া নিয়ে থাকতেন। মহলানবিশ ও দেবীবাবুরা বসতবাড়ী ভাড়া দিতেন না। পাড়ার ছেলেরা ও বাইরের কিছু কিছু ছেলে মন্দিরের প্রাঙ্গণে খেলা করত মহাকোলাহল করে। এখানেই সন্ধ্যার কাছাকাছি মেয়েরা গল্প করতে করতে বেড়াত। তখন সমাজপাড়ায় ছেলের চেয়ে মেয়েই বেশী ছিল। সীতানাথবাবুর ছয় মেয়ে, ভবসিন্ধুবাবুরও পাঁচ-ছয় মেয়ে, প্রবোধবাবুরও চার মেয়ে। কাজেই ছেলেদের বল খেলা অনেকেই পছন্দ করতেন না; বল গিয়ে যখন কারুর ঘরে পড়ত কি জানালার কাঁচ ভেঙে দিত তখন একটা প্রলয়কাণ্ড উপস্থিত হত। দু-চারদিন হয়ত ছেলেরা একটু থামত, কিন্তু দু-দিন বাদেই আবার যে কে সেই। বাবার ঘরে প্রায়ই ফুটবল এসে পড়ত, কিন্তু বাবা কখনও ছেলেদের তাতে কিছু বলতেন না। বাইরের যে সব ছেলেরা খেলতে আসত তার মধ্যে একজন ছিল ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষের পুত্র Harry কেশব ঘোষ।

দেবীপ্রসন্নবাবুর নিজের ছেলে-মেয়ে ছিল মাত্র দু-জন; কিন্তু তাঁর বাড়ীতে অনেক আশ্রিত ও পালিত ছেলেমেয়ের বাসস্থান ছিল। তারা অনেকেই পড়াশুনা করত, কোন কোন মেয়ের ওখান থেকেই বিয়ে হয়ে যেত। এর উপর ঐ বাড়ীতেই ছিল তাঁর 'নব্যভারত' কাগজের প্রেস ও অফিস। অবশ্য আমার বাবারও দুটো কাগজ ছিল, তখন কিন্তু তাঁর নিজের প্রেস হয়নি। দেবীপ্রসন্নবাবুর বাড়ীতে মাঘ মাসে নিজেদের একটা বিশেষ উৎসব হত। লোকডাকা, খাওয়ানো, ঘর সাজানো সবই হত বেশ ভাল করে। অনেকরকম কাজ তিনি স্বহস্তেই করতেন। তবে আমার যতটা মনে পড়ে ভদ্রলোক মিশুক ছিলেন না বিশেষ, অনেকের কড়া কড়া সমালোচনা করতেন।

বাবা যখন অল্প বয়সে কলকাতায় ছিলেন, তখন *Indian Messenger*, 'তত্ত্ব-কৌমুদী', বিশেষত "দাসাশ্রম" ও 'দাসী'র সঙ্গে খুব জড়িত ছিলেন। "দাসাশ্রমে"র তিনি ছিলেন প্রেসিডেন্ট এবং 'দাসী' পত্রিকার সম্পাদক। অনেক সময় 'দাসী'র সব লেখাই বাবাকে লিখতে হত, "দাসাশ্রমে"র সাহায্যের জন্যও তাঁর পক্ষে মোটা টাকাই দিতে হত। ইন্দুভূষণ রায় ছিলেন একজন 'দাস'। কিন্তু সে সব যুগ আমার স্মৃতির বাইরে।

এলাহাবাদে দেখেছি বাবা 'প্রদীপ' এবং 'প্রবাসী' নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন, কলেজের কাজের উপর। 'প্রদীপ' সম্বন্ধে বেশী কথা মনে নেই, 'প্রবাসী'ই ভাল মনে পড়ে। কলেজের চাকরী ছেড়ে দেবার পর 'প্রবাসী'র সঙ্গে 'মডার্ন রিভিয়ু' যুক্ত হল।

আবার যখন কলকাতায় এলেন তখন এই দুইটি কাগজই ছিল তাঁর প্রধান

কাজ। তার সঙ্গে ভাল ভাল বই পাবলিশ করাও চলতে লাগল এবং তা ছাড়া ছিল ব্রাহ্মসমাজের কাজ। তার তিনি প্রেসিডেণ্ট পর্যন্ত হয়েছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রেসটা বাবাই ভাল করে গড়ে তোলেন। নিজের কাগজে কড়া কথা লিখতেন বলে কলকাতা আসবার পরও তাঁর পিছনে পুলিশ সারাক্ষণ লেগে থাকত। এলাহাবাদের চেয়ে এইখানেই বেশী সজাগ ছিল তারা। চিঠি খোলা, গোয়েন্দা লাগানো নানারকম জ্বালাতন চলত।

সাধারণ সমাজের মন্দিরে উপাসনার জন্য আগে বাঁধানো বেদী ছিল। তারপর ঠিক হয় ঐ বেদীটা ভেঙে ফেলে কাঠের বেদী তৈরী করা হবে, যা নাড়াচাড়া এবং খোলা যায়। কিন্তু ভাঙার কথায় নবীনপন্থী ও প্রাচীনপন্থীদের মধ্যে প্রায় কুরুক্ষেত্র বেধে গেল। ঐ বেদীতে কত কত সাধক বসেছেন; সেটা ভেঙে ফেলার মত মহা-পাপ প্রাচীনপন্থীরা ভাবতেই পারতেন না। খুব সম্ভব মহর্ষিও ঐ বেদীতে বসে-ছিলেন। যতদূর মনে পড়ে প্রাচীনদের মধ্যে দেবীপ্রসন্নবাবু, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এঁরা ছিলেন। শেষ পর্যন্ত যখন বেদী ভাঙা হল তখন তাঁরা মন্দিরের ভিতরে দাঁড়িয়ে ভীষণ তর্জন গর্জন করছিলেন। কিন্তু বাধা দিতে পারলেন না।

ব্রাহ্মসমাজের বেদী ভাঙা, রবীন্দ্রনাথকে অনারারী সভ্য করা এবং ব্রাহ্মগণ হিন্দু কিনা এইসব নিয়ে সমাজে প্রায়ই তর্কবিতর্ক ও রীতিমত ঝগড়াঝাটি লেগে যেত। অধিকাংশ স্থলেই বাবা ছিলেন যুবকদের পক্ষে। রবীন্দ্রনাথ 'ঘরে-বাইরে' লিখেছিলেন, এটা ছিল তাঁর একটা অপরাধ বা অযোগ্যতা। কিন্তু তৎসত্ত্বেও যুবক-দের এবং বাবার চেষ্টায় তাঁকে অনারারী মেম্বার করা হয়।

শিবনাথ শাস্ত্রীর মত বাবাও নিজেকে 'হিন্দুব্রাহ্ম' মনে করতেন এবং সেই কারণেই আমার বিবাহের সময় আমি যখন 'আমি হিন্দু নই' বলে রেজিস্ট্রি করতে চাইনি, বাবা তখন আমাকে সমর্থন করেছিলেন।

মাঘোৎসবের সময় ১০ই মাঘ সন্ধ্যার অনেক আগে থেকেই মন্দির লোকে লোকারণ্য হয়ে যেত। একদল মন্দিরে নগরসংকীর্তন আসার জন্য অপেক্ষা করতেন, আর-একদল সংকীর্তনকারীদের সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরে ঢুকতেন। কীর্তনে সে কী উন্মত্ত ব্যাপার। খোল করতাল নিয়ে ছেলেরা নেচে নেচে বেদী প্রদক্ষিণ করত, কারুর-বা দশায় পেত। খোলের বোলে মাদকতা জাগিয়ে তুলতেন খুব নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী।

১০ই মাঘ উপাসনা শেষ হবার পর হত ১১ই-এর জন্য মন্দির সাজানো। সে-ও একটা বিরাট ব্যাপার। সুকুমার রায়, প্রফুল্ল গাঙ্গুলী বা জংলী ও তাঁদের চেয়ে অল্প-

বয়স্ক একদল ছেলে সারা রাত ধরে গাঁদা ফুলের মালা ও অন্যান্য ফুল পাতা দিয়ে ঘরটি সুন্দর করে সাজাতেন। প্রতি বৎসরই ১১ই ভোরে মনে হত সাজটা একটু নূতনরকম হয়েছে। ১১ই মাঘ কে কত ভোরে মন্দিরে স্থান পেতে পারেন এই চেষ্টায় অনেকেই ১০ই রাত্রে এসে সমাজপাড়ায় কারুর না কারুর বাড়ী শুতেন। আমাদের বাড়ীতেও কেউ কেউ এসে রাত কাটাতেন। সমাজপাড়ায় যাঁরা বারো-মাস ঘরভাড়া করে থাকতেন তাঁদের ঘরে যথেষ্ট জায়গা না থাকলে মাঝে মাঝে অন্যান্য কারণেও অনেকের বাড়ীর ছেলেমেয়েরা আমাদের বাড়ী শুতে আসত। পাড়ার লোকেরা পরস্পরের সঙ্গে বেশ একটা আত্মীয়তার ভাব রেখে চলতেন। অবশ্য দুই-একটা পরিবারে একটু ব্যতিক্রমও ছিল। ১১ই মাঘ আমরা খুব ভোরে গিয়ে মন্দিরে বসতাম। কিন্তু বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এত লোক আসতে থাকত যে বয়স্কদের সম্মান দেখাবার জন্য শেষ পর্যন্ত আমাদের আসন ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হত। খাবার সময় পাড়ার অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে আমরাও পরিবেশন করতাম। ফলে মাঝে মাঝে কয়েকটা বেগুনীভাজা মাত্র লাভ হত।

কিশোর বয়সে মানুষের মনে একটা রহস্যময় ধর্মভাব অনেক সময় জেগে ওঠে। ১১ই উপাসনার পূর্বে সমবেতকণ্ঠে যখন "জাগো পুরবাসী, ভগবতপ্রেমপিয়াসী" গানটি ধ্বনিত হয়ে উঠত তখন মনে হত যেন স্বর্গলোক হাতের কাছে এসে পড়েছে, কী যেন একটা অমৃতফল লাভ এখনি হবে। কৈশোরের সে মন পরে আর ফিরে পাওয়া যায় না। তাছাড়া এখন সাধারণ ছেলেমেয়েদের মন ধর্মের দিকে বিশেষ যায় না। উৎসব মানে সবার আগে গিয়ে খেতে বসা এবং ভাল ভাল পোষাক পরা। শুনেছিলাম মহর্ষিদেব সাধারণ সমাজের উৎসবকে ব্রহ্মোৎসব না বলে 'ব্রহ্ম গোল' বলতেন। এখনকার উৎসব দেখলে তিনি কী বলতেন জানি না।

তখনকার দিনে শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ছাড়া ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্যের উপাসনা লোকে খুব হৃদয়গ্রাহী মনে করত। গানের জন্য বিখ্যাত ছিলেন অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, শ্রীমতী প্রতিভা দত্ত প্রভৃতি। গানের সঙ্গে বেহালা বাজাতেন চমৎকার দু-জন। একজন মধ্যবয়স্ক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয় আর একজন যুবক বোতালি (প্রফুল্ল) চট্টোপাধ্যায়। দু-জনেই ছিলেন সুপুরুষ।

সমাজপাড়ায় এসে যাঁদের সব সময় দেখতাম তাঁদের বিষয় ছোটখাট অনেক কথা বারবার মনে পড়ে। কেশবকন্যা মণিকা মহলানবিশ ছিলেন ভারি শান্ত সুমার্জিত মোলায়েম মানুষ, তাঁর চেহারাও ছিল সুন্দর। তিনি তাঁর বাড়ীতে নিয়ম করে তরুণ ছেলেমেয়েদের মাঝে মাঝে পার্টি দিতেন। সেখানে গান গল্প খাওয়া হত।

তাছাড়া সমাজপাড়ার গৃহিণীদের সঙ্গে নিয়ম করে মাঝে মাঝে দেখা করতেন। ভারি মিষ্টি করে গল্প করতেন। গিরিডি ব্রাহ্মসমাজে তাঁকে উপাসনা করতেও দেখেছি। তাঁর ছেলেরা বড় কুনো ছিল বলে ক্ষুদুকে বলতেন, "ওদের তুমি একটু মানুষের সঙ্গে মিশতে শেখাও।"

ভবসিন্ধু দত্ত ছিলেন সুগায়ক ; খুব দরাজ গলা ছিল তাঁর। সমাজের উপাসনায় গান করা ছাড়া বোধহয় কৃষ্ণকুমার মিত্রের মেয়েদের গান শেখাতেন। কুমুদিনীদি ও বাসন্তীদি সমাজেও গান করতেন। ভবসিন্ধুবাবুর চেহারাও ভালো ছিল। তিনি বাবার ছাত্র ছিলেন। এলাহাবাদ থেকে কলকাতায় সমাজপাড়ায় এসে কেবল-মাত্র ভবসিন্ধুবাবুর স্ত্রী ও মেয়েদের পরিচিত দেখেছিলাম, কারণ আগ্রার ব্রাহ্ম নীলমণি ধর মশায় ছিলেন ভবসিন্ধুবাবুর শ্বশুর। এঁরা আগ্রা যাওয়া-আসার পথে এলাহাবাদে আমাদের বাড়ীতে ২।১ দিন থাকতেন। নীলমণিবাবুর ছেলে যামিনী-কান্ত ধর আমাদের বাড়ী অনেকদিন ছিলেন, এলাহাবাদে কিছু একটা পরীক্ষা দিতে এসে।

সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয় তখন বোধহয় কেশব একাডেমির হেডমাস্টারের কাজ ছেড়ে দিয়েছিলেন। তিনি মন্দিরে উপাসনা করা, সঙ্গত সভা করা ছাড়া পিঠাপুরমের রাজার সাহায্যে অনেকগুলি দার্শনিক বই লিখে প্রকাশ করেছিলেন। কিছুদিন মন্দিরে ছেলেমেয়েদের উপনিষদের ক্লাসও নিয়েছিলেন, আমরা যেতাম সেই ক্লাসে। সীতা-নাথবাবু প্রত্যহ গড়ের মাঠে বা আর কোথাও বেড়াতে যেতেন, মাঝে মাঝে ছোট মেয়েদের নিয়ে যেতেন। বেড়িয়ে এসেই জামাকাপড় রোদে দেওয়া তাঁর অভ্যাস ছিল। খুব নিয়মিত চলতেন। তিনি দীর্ঘায়ু হয়েছিলেন। সীতানাথবাবুর ছোটমেয়ে বকুল বয়সে আমার চেয়ে অনেক ছোট; কিন্তু তার সঙ্গে আমার বেশ ভাব হয়েছিল। আমরা পাশাপাশি বারান্দায় বসে রেলিংয়ের ভিতর দিয়ে হাত বাড়িয়ে কখন কখন পুতুল খেলতাম। পুতুলগুলি ছিল বকুলের।

সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তখন জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ। তিনি গেরুয়া কাপড় পরে নিজের ঘরে খাটের উপর বসে থাকতেন। তাঁর জীবিতকালেই তাঁর কন্যারা অনেকে মারা গিয়েছিলেন। এক কন্যা ঐ বাড়ীতেই সপরিবারে বাস করতেন। বাড়ীর উপরতলার আর-সব ঘরগুলি ভাড়া দেওয়া ছিল, একতলাতে তিনি দেবালয় বলে একটি প্রতিষ্ঠান চালাতেন। সেখানে অনেক মানুষের বক্তৃতা কথকতা ইত্যাদি হত। সেখানে আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিপিনচন্দ্র পালের বক্তৃতা শুনেছি। সুন্দরীমোহন দাস মশায় কথকতা করতেন। তার একটা লাইন মনে পড়ে :

"করে এমনি তাকাতাকি
পরমাত্মা নামে পাখী
জীবাত্মা পাখীর আঁখির পবে।"

দেবালয়ে একটা ছোট লাইব্রেরীও ছিল মনে হচ্ছে। সমাজপাড়ার একজন বৃদ্ধ বিকালে প্রাঙ্গণে বেড়াতে এসে কোন ছেলেকে কোন মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে দেখলে তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসতেন তারা কী বলছে শুনবার জন্য। এইজন্য কোন কোন ছোট ছেলে তাঁকে নিয়ে খুব মজা করত। বৃদ্ধকে দেখলেই তারা কোন এক-জন মেয়ের কানের কাছে একটু ফিস্‌ফিস্ করে চলে যেত। তিনি তাড়াতাড়ি ছুটে এসে পড়বার আগেই ছেলেটি দৌড় দিত। একটি ছেলে তার চেয়ে অনেক বড় একটি মেয়ের হাত ধরে কথা বলত। তাই দেখে বৃদ্ধ সেই ১১ বছরের ছেলেটির বাবাকে বললেন, "মেয়েটি বড় লজ্জাশীলা। আপনার ছেলেকে বলবেন যেন ওর হাত না ধরে, ও লজ্জা পায়।" ছেলেটির বাবা বললেন, "ওইটুকু ছেলেকে আমি ওসব বলতে পারব না।"

সীতানাথবাবুর দ্বিতীয়া পত্নী কাদম্বিনী দেবী সুগায়িকা ছিলেন। তিনি মন্দিরে গান করতেন বাইরেও তাঁর গানের ছাত্রী ছিল। তাঁর বৃদ্ধ পিতা কন্যার উপরই বোধহয় নির্ভর করতেন। সীতানাথবাবুর তৃতীয়া কন্যা শান্তিময়ীও সমাজে গান গাইতেন।

নবদ্বীপচন্দ্র দাস মশায় ধর্মপ্রচারক, কিন্তু বেশ সুরসিক ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের সব বাড়ীতেই তাঁর যাওয়া-আসা ছিল। তাঁর একটা কাজ ছিল বিবাহের সম্বন্ধ করা। কত ছেলেমেয়েরই যে তিনি বিবাহ দিয়েছিলেন। আমরা একটু বড় হবার পর প্রায়ই বলতেন, "হয় বিয়ে কর, নয় সমাজের কাজ কর।" সীতা বলত, "নিজে ত আপনি বিয়ে করেননি তবে সবাইকে বিয়ে দিতে এত ব্যস্ত কেন?" নবদ্বীপবাবু হেসে বলতেন, "আরে তখন কি তোদের মত এইরকম মেয়ে ছিল? হয় ধাত্রী নয় বিধবা বিয়ে করতে হত।" আরও প্রাচীনকালে ১০ই মাঘ সকালে তিনি উপাসনা করতেন মন্দিরে। খুব ভীড় হত তখন। একসময় তাঁর চেহারা বেশ ভালো ছিল। পরে বহুমূত্র রোগে শীর্ণ হয়ে যান। উৎসবে আমরা বালক-বালিকা সম্মেলনে বসতে না চাইলে তিনি বলতেন, "যতদিন বিয়ে না হবে, ততদিন এখানে বসতে হবে।" বলে নিজেও বসতেন।

সমাজপাড়ায় যাঁদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল তাঁরা ছাড়া আর ২।১ জনের বাড়ীতেও আমাদের মাঝে মাঝে ডাক পড়ত। একটা ছিল নীলরতনবাবুর বাড়ী, আর একটা

কৃষ্ণকুমার মিত্র মশায়ের বাড়ী। কৃষ্ণকুমারবাবুর স্ত্রী তাঁদের পারিবারিক উৎসবাদিতে আমাদের সবাইকে নিমন্ত্রণ করতেন। 'সঞ্জীবনী' আপিসের দোতলায় তাঁরা থাকতেন। সেই বাড়ীর দুটি ঘর খুব পরিচ্ছন্ন সুন্দর ও রুচিসম্মতভাবে সাজানো দেখতাম। বসবার ঘর কি শোবার ঘর বোঝা যেত না। দুই মেয়ের ডিগ্রি হাতে দুটো খুব বড় বড় ছবি ঘরে টাঙানো থাকত। সুন্দর আলমারীতে ঝকঝকে বই। একটি ঘরে খাওয়া দাওয়া ভাঁড়ার সাদাসিধেভাবে হত দেখলেই বোঝা যেত। তাছাড়া অন্য ঘরও ছিল। একবার কৃষ্ণকুমারবাবুর এক শ্যালকের বিবাহ উপলক্ষে গিয়েছিলাম। ওঁর স্ত্রী বৌ-বরণের গল্প করছিলেন। তিনি সচরাচর শাদা শাড়ী পরতেন। বললেন, "বউ তুলতে হবে, এরকম হলে ত চলবে না।" তাই তাঁর মেয়েদের ভাল শাড়ী থেকে জমকালো দুখানা নিয়ে তিনি ও তাঁর ভগ্নী লজ্জাবতী বসু পরেছিলেন। নিজেদের বর্ণনা করলেন, "আমরা দুই বুড়ো পরী সেজেগুজে ফুলের মালা নিয়ে দরজায় গিয়ে দাঁড়ালাম বউ আসবার সময়।" তিনি অনেক কথাই রসিয়ে রসিয়ে বলতেন। একজনরা প্রেমে পড়েছিলেন, কিন্তু পরস্পরের সঙ্গে কথা বলতেন না। তাতে উনি বলতেন, "কেন? চোখে চোখে কি আর প্রেম হয় না?" এই বাড়ীতেই আমি অরবিন্দ ঘোষকে দেখেছিলাম। একবার মাত্র। সাদা টুইলের সার্ট গায়ে বসে ছিলেন। কাজী নজরুলকেও এই বাড়ীতে একবার দেখেছিলাম, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, উঁচু কলারের রঙীন জামা গায়ে। গান শুনিয়েছিলেন।

সমাজপাড়ায় বাসের সময় জন্ম-মৃত্যু-বিবাহের সঙ্গে খুব ঘন ঘন সাক্ষাৎ হত। তার মধ্যে জন্মটা ছিল খুবই কম। সেকালে ব্রাহ্মসমাজের অনেকেই থাকতেন উত্তর কলকাতায়। কাজেই কারুর মৃত্যু হলে আশেপাশের ছেলেদের ডাক পড়ত। তারা অনন্তের যাত্রীকে একবার সমাজের প্রাঙ্গণে ঘুরিয়ে নিয়ে যেত। কত মানুষকেই সেখানে শেষ দেখা দেখেছি। তার মধ্যে কুন্তলীন প্রেসের এইচ. বসুর চেহারাটা এখনও মনে জলজল করে। তিনি সুপুরুষ ছিলেন। জীবিতকালে উৎসবের উদ্যান সম্মেলনের ব্যয়ভার বহন করতেন। ভারি ঘটা হত সেখানে। উপাসনা, বেড়ানো, খাওয়াদাওয়া, কনে দেখানো, রোমান্স অনেক কিছুই হতে দেখেছি।

বিবাহ ত সমাজপাড়ায় অনেকই দেখেছি। আমরা প্রথম যখন কলকাতায় এলাম তার পরই উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহ হল। তাঁর চাইতে তাঁর ভাই সুকুমার রায় ও ভগিনী শান্তিলতার বিবাহই বেশী মনে আছে। সে দুটি হয়েছিল সমাজপাড়ার চেয়ে একটু দূরে রাজমন্দিরে। সমাজপাড়ার মধ্যে ঘটাপটার বিবাহও মাঝে মাঝে দেখতাম। আবার কোন কোন বিবাহে গোলমালও

বাধত। একটি মেয়ের বিবাহে কন্যাকে কালো পাড়ের শাড়ী পরানো হয়েছিল বলে বরপক্ষীয়া মহিলারা মহাকোলাহল করেছিলেন। আর একজনের বিবাহে বরের দাদা ঝগড়া করে সমস্ত বরযাত্রীদের অভুক্ত তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন। তখন র‍্যাশনের দিন ছিল না, সব বিবাহেই খাওয়া হত। কিন্তু একটি মেয়ের বিবাহে তার বাবার মত ছিল না বলে বাবা কোন আয়োজন করলেন না। তখন কারুর একজনের চেষ্টায় সবাইকে এরারুট বিস্কুট আর চা দেওয়া হল।

ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্য মহাশয়ের একমাত্র কন্যার বিবাহেও খাওয়াদাওয়া বিশেষ হয়নি। প্রাণকৃষ্ণবাবু খাওয়ানোর টাকা দান করবেন বলে সামান্য লুচি তরকারী খাইয়েছিলেন। নীলরতনবাবু তাঁর খুব বন্ধু ছিলেন। তিনি কন্যাকর্তার ব্যবস্থার কথা শুনে নিজের বাড়ীতে মহা ঘটা করে কন্যাকে আয়ুর্দ্ধান্ন খাওয়ালেন। এত-রকমের রান্না তাঁর নিজের কন্যাদের বিবাহে হয়েছিল কিনা সন্দেহ। লোকও প্রচুর নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল।

মাঘোৎসবে প্রত্যহ খাওয়ানোর জন্য যে হোগলার ঘর বাঁধা হত, সেখানে বিবাহের খাওয়াদাওয়া করার বেশ সুবিধা ছিল। তাই উৎসবের পরেই অনেকগুলি বিবাহ হয়ে যেত। তার মধ্যে ডাঃ মৃগেন্দ্রলাল মিত্রের জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ খুব ঘটা করে হয়েছিল। আত্মীয়, বন্ধু, সমাজের সভ্য ছাড়াও পাশের কাঁসারীপাড়ার বস্তির সকলকে তিনি নিমন্ত্রণ করে খাইয়েছিলেন। তারা বোধহয় বিরাট একটা মাছ উপহার দিয়েছিল। মাঝে মাঝে বাঙালী-অবাঙালীর বিয়েও হত, তবে আজকালকার মত এত নয়। এইসব বিয়েতে কখনও হিন্দি কখনও-বা ইংরেজীতে বিবাহ অনুষ্ঠান হত। ইংরেজী জানে না এমন বাঙালী মেয়ের সঙ্গেও অবাঙালীর বিবাহ দেখেছি।

একবার এক ভদ্রমহিলা মফঃস্বল থেকে কন্যা ও ভাবী জামাতাকে নিয়ে "সাধনা-শ্রমে" এলেন ব্রাহ্মমতে তাদের বিবাহ দেবেন বলে। কন্যাটির মাথায় সিঁদুর। তার মা বললেন, "সিঁদুর নয়, কালীঘাটে ফাগ দিয়েছিল।" যাই হোক, "দেবালয়ে"র ঘরে যথারীতি বিবাহ হল। বরকন্যা বিদায়ের পর জানা গেল, ভদ্রমহিলা একজন দুর্দান্ত প্রতাপশালিনী জমিদারনী। তিনি জামাতার উপর রাগ করে বিবাহিতা সধবা কন্যাকে এনে আবার অন্যের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত সে বিবাহের কী হল এখন আর মনে পড়ে না।

একবার কী একটা কারণে ঝগড়া হওয়াতে ব্রাহ্ম যুবকেরা একটা আলাদা মাঘোৎসব করেছিলেন। সুকুমার রায় ছিলেন তাদের দলপতি। তিনিই উপাসনা করেন। অসময়ে যদি চলে না যেতেন সমাজের ছেলেদের তিনি গড়ে তুলতে পারতেন।

আজকালকার লোকে সুকুমার রায় বলতে সুধু 'আবোলতাবোল' প্রণেতাকে বোঝে। সেকালে তিনি ব্রাহ্মসমাজের ছেলেদের 'তাতাদা' ছিলেন এবং তিনিই ছিলেন ব্রাহ্ম যুব আন্দোলনের নেতা। শুনেছি একবার একজন উপেন্দ্রবাবুকে বলে-ছিলেন, "আপনার ছেলে আপনারই উপযুক্ত হয়েছেন।" তাতে উপেন্দ্রবাবু বলেন, "আমার চেয়ে আমার ছেলে অনেক ভালো হয়েছে।" উপেন্দ্রবাবু নিজে বেহালা বাজানো এবং গান শেখানো ছাড়া ছবি আঁকতেন এবং গল্প লিখতেন। তাঁর ব্যবসায় হাফটোন ব্লকের কথা অবশ্য আলাদা। তাঁর ছেলেমেয়েরা সুকুমার এবং সুখলতাও গল্প লিখতেন এবং ছবি আঁকতেন। সুকুমারবাবুর গল্প সবই হাসির গল্প। ছেলেবেলা 'মুকুল' কাগজে উপেন্দ্রবাবুর ঘ্যাঁঘাসুরের গল্প আমরা খুব ভালবাসতাম। তাঁর 'ছেলে-দের রামায়ণ' ও 'মহাভারত' ত অপূর্ব। আরও অনেক গল্প তাঁর সুবিখ্যাত।

কলকাতায় এসে আর একটি প্রতিষ্ঠানের সাক্ষাৎ পেলাম সেটি ছাত্রসমাজ। এই ছাত্রসমাজ পূর্বে আমাদের পিতৃস্থানীয়দের অনেকের চরিত্র গঠনে সাহায্য করেছিল, পরে আমাদের সমসাময়িকদের চরিত্র গঠনেরও সহায় ছিল। তবে প্রথম যুগের মত শক্তিশালী আর পরে ছিল না। আমাদের সময়ে প্রতি সপ্তাহে শনিবার সমাজমন্দিরে ছাত্রসমাজের বক্তৃতা হত। সেখানে শিবনাথ শাস্ত্রী, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বিনয়েন্দ্রনাথ সেন, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, রজনীকান্ত গুহ প্রভৃতি অনেকের বক্তৃতা হত। কয়েকবার রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতাও হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতায় সে কী আশ্চর্য লোকসমাগম। মন্দিরের হলটিতে হয়ত হাজারখানেক লোক ধরে। বাইরে সমস্ত প্রাঙ্গণে, গলিতে পাশের বাড়ীতে ছাদে ও বারান্দায় লোকারণ্য। তার উপর কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের রাস্তা জুড়ে সুকিয়া স্ট্রীট থেকে গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন পর্যন্ত লোক দাঁড়িয়ে যেত। স্বয়ং বক্তাই সহজে ঢুকতে পথ পেতেন না। যুবকরা বডি গার্ড হয়ে অনেক কষ্টে তাঁকে হলে ঢোকাত। মহা হট্টগোলের মধ্যে যেই তাঁর কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়ে উঠত, অমনি সব গোলমাল চুপ। বক্তৃতা অন্তে ছিল জুতো হারানোর পালা। বেদীর কাছে মানুষ জুতো খুলে ঢোকে, ফিরে অনেকেই অপরের জুতো পরে চলে যেত। রবীন্দ্রনাথের জুতো প্রায়ই হারাত। লোকে হয়ত ইচ্ছা করেই নিয়ে পালাত। একবার ত তিনি নগ্ন পায়েই বাড়ী ফিরে গেলেন। তারপর থেকে যখন আসতেন, মন্দিরে ঢুকবার আগে 'প্রবাসী' আপিসে জুতা রেখে যেতেন।

শিবনাথ শাস্ত্রী ছিলেন আশ্চর্য মন-জাগানো বক্তা। তাঁর প্রত্যেকটি কথা প্রত্যক্ষ অনুভূতির থেকে বেরিয়ে মানুষের বুকে এসে ধাক্কা দিত। তখনকার দিনে

তাঁর মত করে ঘরোয়া ভাষায় মানুষের মনকে নাড়া দিয়ে বক্তৃতা দিতে কেউ পারতেন না। অন্যায় বা অনাচারের বিরুদ্ধে যখন তাঁর মন উত্তেজিত হয়ে উঠত তখন ভাষার শোভন অশোভন জ্ঞানও ভুলে যেতেন। কোন্ যুগে তাঁর বক্তৃতা শুনেছি কিন্তু আজও এক একটি কথা মনে পড়ে যায়। বিদ্রোহী মনকে শাসন করে তিনি বলতেন, "মন, তুমি দুধকলা খাবে? তোমাকে চাবুক মারব।" মানুষ নানা কাজের মধ্যে ঘুরপাক খেয়ে প্রকৃত সাধনা ভুলে গেলে তিনি বলতেন, "ওরে বাঁশ-বনে ডোমকানা।" থিয়েটারে বাবুরা নটীদের সঙ্গে কীভাবে নাচে বলতে গিয়ে একবার তিনি একটা গ্রাম্য কথা ব্যবহার করেছিলেন। বক্তৃতার শেষে হেমমাসিমা এসে নিজের বাবাকে তাই ভীষণ বকতে লাগলেন!

শাস্ত্রী মহাশয় আমার বাবার কাছে প্রায়ই আসতেন। এই সমাজপাড়াতেই বাবা তাঁর 'আত্মচরিত', 'বিধবার ছেলে', *Men I Have Seen* ও *History of the Brahmo Samaj* প্রভৃতি বই প্রথম প্রকাশ করেছিলেন। শেষোক্তটির জন্য বাবাকে খুব পরিশ্রম করতে হয়েছিল।

ছাত্রসমাজের বক্তাদের মধ্যে নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বক্তৃতা দিতেন মেঘমন্দ্র-স্বরে। ভাষাও যেমন বিশুদ্ধ, কণ্ঠও তেমনি গুরুগম্ভীর। বক্তৃতা দিতে একবার সরোজিনী নাইডুও এসেছিলেন। তখন তাঁর বয়স কম, ছোট্টখাট্ট দেখতে। ভারি সুন্দর সাজসজ্জা করতেন। সেকালে বাংলাদেশের মেয়েরা সাদা কাপড়ই পরতেন বেশী। কিন্তু সরোজিনী দাক্ষিণাত্যবাসিনী হওয়ায় তাঁর পোষাকে সুন্দর সুন্দর রঙের চমক দেখা যেত। কাপড়ের প্রত্যেকটি ভাঁজ নিখুঁতভাবে শরীর ঘিরে ঘিরে উঠত। মনে হত গায়ের উপর কেউ কাপড় পালিশ করে দিয়েছে। আজকাল বাঙালী মেয়েরা সাজপোষাক করবার সময় সবাই দক্ষিণী ধরনে কাপড় পরেন। সেকালে কিন্তু তা ছিল না। সকলে হয় বাংলা ধরনে নয় জ্ঞানদানন্দিনী প্রবর্তিত ব্রাহ্মিকা ধরনে শাড়ী পরতেন। সরোজিনী তখন থেকেই দক্ষিণী ধরনে কাপড় পরতেন। তাঁর মা বাঙালীর মেয়ে, বাঙালীর স্ত্রী, কিন্তু তিনিও দক্ষিণী ধরনে কাপড় পরতেন, তবে মাথায় কাপড় দিতেন। বেশ মিষ্টি করে কথা বলতেন তিনি।

স্বদেশী আন্দোলনের পর গোয়েন্দা পুলিশের ভাবনা ছিল বাবার নিত্য সহচর। যখন-তখন উপরওয়ালাদের কাছ থেকে কড়া হুকুম ও ধমক আসত। তার ফলে শুধু যে দুশ্চিন্তা ছিল তা নয়, আর্থিক ক্ষতিও প্রচুর ছিল। কত সময় সমস্ত ছাপা ফর্মা পুড়িয়ে ফেলে আবার নূতন ফর্মা ছাপা হত।

বাড়ী সার্চের গোপন খবরও আসত। তখন যেসব কাগজপত্র আপিসে রাখা

নিরাপদ ছিল না, বাবা সেগুলি বেয়ারিং পোস্টে এলাহাবাদের বামনদাসবাবুর নামে ডাকে দিয়ে দিতেন। বেয়ারিং পোস্টের কাগজ হারাত না। আর এক নিত্য ব্যাপার ছিল censor-এ চিঠি খুলে পড়া এবং পরে সেটি জুড়ে পাঠানো। কোন কোন চিঠি পাওয়াই যেত না একেবারে। এইরকম একটা চিঠি মোতিলাল নেহরুর বিচারের সময় আদালতে তাঁর দস্তখত প্রমাণ করবার জন্ম ব্যবহৃত হয়। এই চিঠি মোতিলাল বাবাকে লিখেছিলেন কিন্তু বাবার হাতে পৌঁছয়নি। মোতিলাল আদালতে সেটি দেখে মুচকি হাসি হেসেছিলেন।

সমাজপাড়ায় বাল্যসমাজ, শিশু সমিতি, মহিলা সমিতি প্রভৃতি অনেক ছোটখাট সমিতি ছিল। বাল্যসমাজ "দেবালয়ে"র ঘরে প্রতি রবিবার সন্ধ্যায় উপাসনার সময় বসত। যেসব ছোট ছেলেরা মন্দিরে বসত না তারাই ছিল এর সভ্য। এখানে গান গল্প বলা ইত্যাদি হত। প্রাইজও হত বছরে একবার খুব ঘটা করে। একবার প্রাইজে বেশ মজার একটি অভিনয় হয়েছিল। ছেলেমেয়েরা কেউ "বাঃ" কেউ "কিন্তু" কেউ "যদি" কেউ-বা "বটে" সেজেছিল। "বাঃ" স্টেজে ঢুকেই বলল :

> "আমার নাম বাঃ,
> বসে থাকি তোফা তুলে পায়ের উপর পা।"

"যদি" ঢুকেই বলল :

> "আমার নাম যদি,
> আশায় আশায় বসে থাকি হেলান দিয়ে গদি।"

"বটে" ঢুকেই বলল :

> "আমার নাম বটে,
> কটমটিয়ে তাকাই যখন সবাই পালায় ছুটে।"

প্রত্যেকের গানের প্রথম লাইনটাই মনে আছে, বাকি ভুলে গিয়েছি। শেষের দিকে একটা গানে ছিল :

> "নিষ্কম্মারা গেল কোথা
> পালাল কোন দেশে ?"

এই গানগুলি উপেন্দ্রকিশোরবাবুর লেখা কি সুকুমার রায়ের লেখা এতদিন পরে মনে পড়ছে না। বাল্যসমাজে গল্প বলার ভার মেয়েরা নিতেন। সীতা এত ভাল গল্প বলত যে তার দিনে ছেলেমেয়েতে ঘর ভরে যেত। আমি একবার বাল্যসমাজের সম্পাদিকা হয়েছিলাম, তখন প্রাইজের দিন স্যর নারায়ণ চন্দ্রভারকারকে প্রেসিডেন্ট করা হয়। তিনি ধন্তবাদ দেবার সময় আমার চেয়ে আমার বাবাকেই বেশী ধন্তবাদ

দিলেন। সভাতে শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। তিনি আমাকে ধন্যবাদ দিয়ে সভাপতির ত্রুটিটুকু সেরে নিলেন।

আমরা কিছুদিন "সাধনাশ্রমে"র বারান্দায় একটা নাইট স্কুল করেছিলাম। পাড়ার ঝিদের ছেলেমেয়েরা পড়তে আসত। তাতে একবার একটি মেয়েকে শাস্তি দিয়ে বলা হয়েছিল, "তোমাকে ক্লাসে নামিয়ে দেব।" সে বলল, "আমার নীচে কেলাসই নেই ত কোথায় নামাবে?" নাইট স্কুলটা খুব বেশীদিন চলেনি।

নাইট স্কুল এবং বাল্যসমাজ করার চেয়ে অনেক ভারিক্কি একটা কাজের সম্ভাবনা একবার হয়েছিল। তাতে আমরা খুবই বিস্মিত হয়েছিলাম। একবার বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন বিদেশী অধ্যাপকের বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিলাম। সেখানে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। সভাভঙ্গের পর কেউ একজন তাঁর কাছে আমাদের দুই বোনের পরিচয় দিলেন। আশুবাবু বললেন, "তোমরা আমার University-তে বাংলা পড়াবার ভার নেবে?" হুবহু কথাটা আজ মনে নেই, কিন্তু তাৎপর্যটা এইরকম। আমরা বি. এ. পাশ মাত্র। এম্. এ. পাশ করিনি, তাঁর প্রস্তাবে অবাক হয়ে গেলাম। পরে আমাদের এক অধ্যাপককে গল্পটা বলে বললাম, "উনি বোধহয় ঠাট্টা করেছিলেন।" অধ্যাপক বললেন, "আশুবাবু কখন ঠাট্টা করে বলেন না। কাজ নেওয়া উচিত ছিল।"

আমাদের কিশোর বয়সে সমাজপাড়ায় অনেক ছেলেও ছিল। কিন্তু আমরা তাদের সঙ্গে কথা বলতাম না। সেইটাই ছিল নিয়ম। কেউ পরিচয় করিয়ে না দিলে কথা বলতে নেই। প্রত্যহই তাদের দেখতাম, তাদের বিষয় অনেক গল্পও শুনতাম। কিন্তু এমনভাবে চলতাম যেন ওদের কখনও দেখিইনি। একবার একটা মেলায় বেড়াতে গিয়েছিলাম, সেখানে একটি ছেলে আমাদের সবাইকে একটা করে ফুলের মালা কিনে দিয়েছিল। আমরা ত মহাবিপদে পড়লাম। না নিলে অসভ্যতা হবে, নিলে উচিত কাজ হবে না। অগত্যা হাতে করে নিয়ে অন্তরালে একসময় ফেলে দিলাম।

অবশ্য সব মেয়েই যে আমাদের মত এই নিয়ম পালন করত তা নয়। অনেকের ছেলেদের সঙ্গে বেশ ভাব ছিল, বেশ অল্প বয়সে রীতিমত রোমান্সও কিছু কিছু চলত। অনেক বাড়ীতে উপযুক্ত ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদের আলাপ করিয়ে দেওয়া হত। আমাদের বাড়ীতে ওসব বালাই ছিল না। ক্ষুদ্র বন্ধুরা জনকয়েক আসত, তাদের সঙ্গে অবশ্য গল্প করতাম। আর কখন-সখন অন্য বাড়ীতে কারুর কারুর সঙ্গে আলাপ হত।

কলকাতায় এসে বালিকাবন্ধুদের মধ্যে সমাজপাড়ার ও কলেজের বন্ধুদের ছাড়া আমার আর একটি বন্ধুলাভ হয়েছিল। সে ডাঃ সরকারের কন্যা নলিনী। ছেলেবেলার সে বন্ধুত্ব ভারি আনন্দময় ছিল। জীবনের নানা ঘূর্ণিতে এবং নিজের শারীরিক অক্ষমতায় সে বন্ধুত্ব ক্রমে চাপা পড়ে যায়, কিন্তু তার স্মৃতিটা এখনও সুখকর। মনে আছে নীলরতনবাবু একবার আমাকে ও নলিনীকে ভোর পাঁচটার সময় শিবপুরের বাগানে বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে ও তাঁর মেয়েদের সঙ্গে দার্জিলিঙেও নানা জায়গায় বেড়িয়েছি। অত কাজের মধ্যেও মেয়েদের দিকে তাঁর খুব দৃষ্টি ছিল।

আমরা যখন বেথুন কলেজে পড়তাম তখন উদ্ভিদবিদ্যা ছাড়া সেখানে কোন বিজ্ঞান পড়ানো হত না। বিজ্ঞান পড়বার জন্য নলিনী ও সুরীতি ছেলেদের সঙ্গে সিটি কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। তখন মেয়েরা ছেলেদের কলেজে বিশেষ পড়ত না। বহুপূর্বে শুনেছি ডাঃ পি. কে. রায়ের কন্যারা প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়েছিলেন। ছেলেরা তাঁদের নানারকমে বিরক্তও করত শুনেছি। বেথুনে এমনকি অঙ্কশাস্ত্রও ম্যাট্রিকের পর কেউ পড়তে পেত না। আমার এবং আমার বন্ধু মোহিতকুমারীর অঙ্ক নেবার শখ ছিল। আমাদের স্কুলের হেডমাস্টারমশায় বলেছিলেন কলেজের course আমাদের প্রাইভেট পড়িয়ে দেবেন। সেই ভরসায় আমরা অঙ্ক নিয়েছিলাম I.A.-তে। কখনও বেথুন স্কুলে কখনও মোহিতের বাড়ীতে আমাদের ক্লাস হত। আমরা পড়তে বসবার আগে মোহিতের বউদিদি আমাদের দোবারী চিনি দিয়ে এক প্লেট ঘন দুধের সর খেতে দিতেন। মোহিত ডাঃ প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের কন্যা। মোহিতের সেজদিদি স্নেহলতা মৈত্র অঙ্কশাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। আমাদের অঙ্কশাস্ত্র চর্চা এভাবে কিন্তু বেশীদিন চলল না। শেষে পরীক্ষার মাস দুই আগে অধ্যাপক সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে প্রাইভেট টিউটার রেখে আমি কোনরকমে Statics and Dynamics পড়লাম। বলতে গেলে তার জোরেই পাশ করলাম, কারণ অন্যান্য অঙ্ক খুবই সামান্য শেখা হয়েছিল। যাই হোক অঙ্কে বেশী নম্বর না পেলেও এবারেও একটা স্কলারশিপ পেলাম। বেথুনে সর্বদাই অনেক প্রাইজ থাকত. তাই কপালে এবারেও একটা সোনার মেডাল জুটে গেল। যতদিন কলেজে পড়েছি, প্রতি বৎসর ইন্‌স্পেক্টার এসে জিজ্ঞাসা করতেন, "তোমরা কে কে অঙ্ক চাও বল।" আমরা কয়েকজন প্রতিবারই হাত তুলতাম। কিন্তু চার বৎসরের মধ্যে হাত তোলানো ছাড়া অঙ্ক শেখানো বিষয়ে আর কোন চেষ্টা কেউ করলেন না।

সতীশবাবু আমাদের বাড়ীতেই দাদাকে আর প্রশান্তকে বি. এস. সি.-র অঙ্ক কষাতেন। একইসঙ্গে আমার আই. এ.-র অঙ্কও আমাকে করাতেন। তিনি খুব

মিশুক ছিলেন। অঙ্ক কষাতে এসে আমাদের সঙ্গে খুব ভাব করে নিয়েছিলেন। মাঝে মাঝে রবিবারে আমাদের কুকারে খিচুড়ি রান্না শিখিয়ে আমাদের সঙ্গেই খেতেন। তাঁর বাড়ীতে আমরা দুই-একবার নিমন্ত্রণে গিয়েছি।

সে যুগে বেথুনে যাঁরা পড়তেন তাঁরা প্রায় সকলেই পরস্পরের সঙ্গে বাংলায় কথা বলতেন। আমাদের চেয়ে চার ক্লাস উপরে মারি ব্যানার্জি ও মোজেল নামে দুটি মেয়ে পড়তেন, তাঁরা বাংলা জানতেন না বোধহয়, সর্বদাই ইংরেজীতে কথা বলতেন। যদিও একজন বাঙালী, কিন্তু দুইজনই মেমসাহেবের মত পোষাক পরতেন। তখন আমরা স্কুলে। কলেজে ওঠার পর অর্থাৎ অল্প পরেই আমাদের ক্লাসে একটি শাড়ী পরা খাঁটি বাঙালী মেয়ে ভর্তি হয়। সে ভীষণ মেমসাহেবী করত। তাই ক্লাসের আর একটি মেয়ে তার নামে একটা কবিতা বানিয়েছিল :

"পুরাকালে ছিলেন—মস্ত একজন মেম।
Black sea-তে পড়ে গিয়ে তাঁর হল deepest shame."

আমাদের সময় কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন মিসেস কুমুদিনী দাস। তিনি খুব সামান্যই পড়াতেন ; বি. এ. ক্লাসে মাঝে মাঝে *Cowper's Letters* হাতে করে আসতেন। খুব মিহি গলায় খানিকটা পড়ে চলে যেতেন। অন্য দু-জন ইংরেজীর অধ্যাপক ছিলেন পরেশনাথ সেন ও বিজয়গোপাল মুখোপাধ্যায়। পরেশবাবু যা পড়াতেন ভাল করে বুঝিয়ে দিতেন। কিন্তু নোটস বিশেষ দিতেন না। বিজয়বাবু মিল্টন শেক্সপীয়র সবের নোটস্ দিতেন এবং বইয়ের পাশে লিখে নিতে বলতেন। বিজয়বাবুর ইচ্ছা ছিল যে আমি Eng. Hons. নিই ; কিন্তু কলেজে পড়াবার ব্যবস্থা ছিল না। তবু তাঁর কথামত কয়েকটা মোটা মোটা বই কিনেছিলাম ; কিন্তু নিজে নিজে পড়ে শেষ করতে পারলাম না বলে Hons. আর দেওয়া হল না। আমার বইগুলি পরে সীতার কাজে লাগল।

আমাদের সংস্কৃতের পণ্ডিত ছিলেন দেবেনবাবু। তাঁর পুরো নামটা ভুলে গিয়েছি। খুব ছোটখাট ফরসামত মানুষ। চোগা চাপকান পরে আসতেন। তখনকার দিনের ছাত্রছাত্রীরা আদিরসাত্মক জিনিস বা অশ্লীল জিনিস গুরুজনের সামনে পড়তে লজ্জা পেত। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যে ঐ জিনিসগুলির প্রাচুর্য আছে। আমি তাই সে-রকম কিছু পাঠ্য থাকলে একটা ছুতানাতা করে ক্লাস থেকে পালাতাম। ক্লাসের মেয়েরা আমাকে তার জন্য পরে খুব বকুনি দিত।

কলেজে সুরবালা ঘোষ ও সুরবালা সিংহ নামে দু-জন মহিলা অধ্যাপিকা ছিলেন। মিস ঘোষ কুমুদিনী দাসের পর কিছুদিন বোধহয় প্রিন্সিপ্যালের

কাজ করেন। তাঁরও পরে আসেন রাজকুমারী দাস। এ সময় আমরা কলেজে ছিলাম না।

আমরা কলেজে উঠবার আগেই ড. হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ের ভাবী পত্নী বঙ্গবালা আমাদের কলেজের অধ্যাপকদের কাছে আসতেন বোধহয় প্রাইভেট এম্. এ. পড়বার জন্ম। তাঁকে এবং আর একটি মহিলাকে প্রায়ই দেখতাম বিজয়গোপাল মুখোপাধ্যায়ের কাছে বসে কথা বলতে। মেয়েরা তখনও বিশ্ববিদ্যালয়ে এম্. এ. পড়তে যেত না বলে আমার ধারণা। আর দুই-চার বছর পরেই তা শুরু হয়। তাঁদের মধ্যে শকুন্তলা রাও, কমলকুমারী মৈত্র, মণীষা রায় এবং রেজিনা গুহ-এর এক কনিষ্ঠা ভগিনীকে মনে পড়ে।

আমাদের অধ্যাপক পরেশবাবুর মত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মার্জিতরুচি ফিটফাট অধ্যাপক কমই দেখেছি। কলেজের দরজায় ধুলা পড়ে থাকত বলে তিনি দরজা খোলা বা বন্ধ করার সময় নখের ডগা দিয়ে দরজা ধরতেন। ছাত্রীরা কেউ কোন তথ্য ভুল বললে তিনি বলতেন, "You can't create history." তবে একটু আধটু অজ্ঞতাকে তিনি বিশেষ গ্রাহ্য করতেন না; বলতেন, "Prime Minister-এর নাম না জানলেই কিছু সর্বনাশ হয় না।" তখন অবশ্য স্বদেশী Prime Minister-এর যুগ নয়। ইনি ক্লাসে কখন হাসতেন না বা বাংলায় কথা বলতেন না।

লজিক ও ফিলসফি পড়াতেন হেমচন্দ্র দে। তিনি ভীষণ সাহেব ছিলেন, কখনও ইংরেজী ছাড়া কথা বলতেন না। কথার স্বরটাও সাহেবদের মত করতেন।

উদ্ভিদবিদ্যা পড়াতেন হেমপ্রভা বসু; তিনি ছিলেন স্যর জগদীশের কনিষ্ঠা ভগিনী। ইনি স্কুলেও কিছু পড়াতেন। একটু খামখেয়ালী ছিলেন। স্কুলের মেয়ে হলেও সীতা তাঁর খুব প্রিয় ছিল।

ইকনমিক্স পড়াতেন অক্ষয়কুমার সরকার। এঁর কাছে আমি বি. এ. ক্লাসে ওঠ-বার পর পড়েছি। প্রায়ই বলতেন, "তুমি এম. এ.-তে ইকনমিক্স নিও।" অবশ্য আমার ভাগ্যে তা হয়নি। বি. এ.-তে ইংরেজী অনার্স নিয়ে ছেড়ে দিলাম বলে ইংরেজীর অধ্যাপকরা বলতেন, "এম. এ.-তে ইংরেজী নিও।" আমার এম. এ. পড়াটা হাস্যকর রকম হয়েছিল। বি. এ. পাশ করবার দুই-তিন বৎসর পরে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলাম। কিন্তু শুধু টাকা নষ্ট করাই সার হল। একদিন ক্লাস করেই পালিয়ে এলাম। পরে আর যাইনি। দু-জন প্রফেসারের কাছে পড়েছিলাম—একজন প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ আর একজন অপূর্বকুমার চন্দ। পরে প্রায়ই অপূর্ববাবু ঠাট্টা করে বলতেন, "আমি এমনই পড়ালাম যে আপনি একদিনেই ভয় পেয়ে পালিয়ে

এলেন ।" অপূর্ববাবু তাঁর স্মৃতিকথায় ছাত্রী হিসাবে আমার নাম লিখেছিলেন দেখেছিলাম।

আমাদের কলেজের জীবন কিছু ঘটনাবহুল ছিল না। সারা বছরে প্রাইজ, ছাত্রী সম্মেলন এইরকম দুই-একটা নূতনত্ব ঘটত। কখন কখন সিনেমা দেখানোও হত। তবে প্রেমের ছবি থাকলে তার উপর একটা বিরাট হাতের ছায়া পড়ে ঢাকা দিত। এইরকম বোধহয় কর্তৃপক্ষের আদেশ ছিল। যাই হোক, ছেলেমানুষে থোড় বড়ি খাড়ার মত একঘেঁয়ে জীবনেও গল্প করবার বিষয়ের অভাব বোধ করে না। কাজেই আমাদেরও গল্পের বিষয়ের অভাব হত না। কোন কোন অধ্যাপকের ইংরেজী উচ্চারণ খারাপ ছিল বলে অনেক মেয়ে তাঁদের নিয়ে প্রায়ই রসিকতা করত। মনে হত যে তাঁদের সহকর্মীরাও একটু আধটু করতেন। ইংরেজী বক্তৃতার সময় অনেকে মিলে তাঁকে ঠেলে পাঠাতেন।

এইরকম সাদামাটা কলেজে একবার জলন্ধর কন্যা মহাবিদ্যালয় থেকে বোধহয় লজ্জাবতী নাম্নী এক অধ্যাপিকা কলেজ দেখতে এলেন। তিনি আমাদের ক্লাসে এসে একটাও ইংরেজী বা হিন্দী বললেন না। বেশ স্পষ্ট করে আস্তে আস্তে সংস্কৃতে কথা বলতে লাগলেন। মেয়েরা ত অপ্রস্তুত। অগত্যা আমি আমার স্বল্পবিদ্যায় যেটুকু কুলোল তাই দিয়েই সংস্কৃতে তাঁর কথার উত্তর দিতে বাধ্য হলাম।

বি. এ. পড়বার সময় আমাদের ক্লাসে আর দুই-একটি নূতন মেয়ে এলেন। তার মধ্যে একজন রানী চ্যাটার্জী। রানী পরে লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের পুত্রবধূ হন। রানীর কথা বলার ধরন খুব মজার ছিল। তার পূর্বতন কলেজের অধ্যাপিকাদের বাংলা বলা সে অনুকরণ করে দেখাত। কলেজটি খৃষ্টীয় প্রাচীনপন্থী কলেজ, কাজেই বাংলার প্রতি খুব অনুরাগ তাদের ছিল না। সেই ধরনের কথা অভিনয় সহকারে না দেখালে তার রসটা ঠিক উপলব্ধি করা যায় না। রানী বোর্ডিঙে থাকতেন, আগের বোর্ডিঙের খাওয়া নিয়েও তার অনেক হাসির গল্প ছিল।

বোর্ডিঙে কয়েকজন কাপড়ওয়ালা আসত। তার মধ্যে একজনের নাম ছিল নাদির শা। সে দেখতে খুব ভাল ছিল এবং মেয়েদের সঙ্গে খুব রসিকতা করত। ভাল ভাল কাপড় ফরসা মেয়েদের গায়ের উপর ছুঁড়ে দিয়ে সে বলত, "আপনাকে কী সুন্দর যে দেখাবে তা আর কী বলব।" তারপর অবশ্য আকাশস্পর্শী দাম হাঁকত। কোন কোন মেয়ে বোকার মত যত খুশি কাপড় কিনত, তারপরই বাড়ী থেকে বকুনি আসত ডাকে। এমনকি উপরওয়ালাদের কাছে নালিশও আসত।

'গোরা' উপন্যাস আমরা এলাহাবাদে থাকতেই 'প্রবাসী'তে বেরোতে শুরু করেছিল। কলকাতায় এসে দেখলাম আমাদের সমবয়সীদের মধ্যে 'গোরা' নিয়ে খুব আলোচনা হয়। সুচরিতা ও গোরার ধরনের সঙ্গে নিজেদের কোন কোন বিষয়ে মেলাবার চেষ্টা অনেকের ছিল। এই সূত্রেই শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল বাড়তে থাকে। অনেকে আমাদের শান্তিনিকেতন দেখতে যাবার জন্য উৎসাহ দেন। এই দলে নলিনী এবং তাঁর পিসতুতো বোন সুরীতিও ছিলেন। নূতন একটা আদর্শের বিদ্যালয় দেখতে, বিশেষত রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য পেতে আমরা খুব উৎসুক হয়ে উঠলাম। কিন্তু ওইরকম বয়সে আমাদের নিজেদের দল বেঁধে ত কেউ যেতে দেবেন না। নলিনীর উৎসাহে বাবাকে রাজী করালাম আমাদের শান্তিনিকেতনে নিয়ে যেতে। বাবা নিজেও অনেকদিন থেকে ওখানে যেতে ইচ্ছুক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ডাকও দিতেন। আমরা ৬।৭টি মেয়ে বাবার সঙ্গে শান্তিনিকেতনে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মশায়ের নীচু বাংলায় গিয়ে উঠলাম। আমাদের টানাটানিতে বাবার ইচ্ছাও পূর্ণ হল। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এতদিনের যোগ থাকা সত্ত্বেও বাবার শান্তিনিকেতন কখনও দেখা হয়নি। সেবার প্রথম 'রাজা' অভিনয় হয়। মাটির 'নাট্যঘরে' খড়ের চালার তলায় সদ্য তোলা ফুল-পাতায় সজ্জিত রঙ্গমঞ্চে গান ও অভিনয় যেন আতসবাজির ফুলের মত ঝলমল করে ঝরে পড়তে লাগল। যে পৃথিবীতে আমরা বাস করতাম তার থেকে নূতন একটা লোকে যেন এসে পড়লাম। সেবার সুধীরঞ্জন দাস (পরে জস্টিস) সেজেছিলেন সুদর্শনা। জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কাঞ্চীরাজ। অভিনয়ের আগে এবং পরেও রবীন্দ্রনাথের আনন্দ বিতরণের কী সমারোহ! অতিথিশালার উপরের ঘরে বসে একসঙ্গে পঞ্চাশটা গান পর্যন্ত তিনি অনায়াসে গেয়ে গেলেন। অতিথিদের সঙ্গে করে নিজে সমস্ত আশ্রম দেখালেন। মনে হত তাঁর যেন অলৌকিক শক্তি আছে। তাঁর আতিথ্য, তাঁর সৌজন্য, তাঁর বাৎসল্য, তাঁর কণ্ঠমাধুর্য, তাঁর দাক্ষিণ্য ক্ষমতা, তাঁর প্রসন্নতা কিছুরই যেন সীমা ছিল না। তিনি যেন ছিলেন কল্পতরু। তাঁর কাছে যা চাওয়া যেত তাই পাওয়া যেত। না চাইতেও যে কত দিয়েছেন তা বলা যায় না। গভীর জ্যোৎস্না রাত্রে অতিথিদের নিয়ে পারুলবনে তিনি হেঁটে যেতেন সঙ্গীত উৎসব করতে। অন্ধকার রাত্রে বিছানা ছেড়ে আলো হাতে উঠে আসতেন এই অতিথিদের গাড়ীতে তুলে দিতে।

শান্তিনিকেতনে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও আরো অনেক মানুষকে চিনলাম। কেউ বড় কেউ ছোট। হেমলতা দেবী অবশ্য সর্বপ্রথম। ক্ষিতিমোহনবাবুর সরস কথাবার্তা ছিল উপভোগ করার মত। তাঁর 'দাদূ' 'কবীর' প্রভৃতি পাঠও অবশ্য

অতিথিরা উপরিলাভ করতেন। সঙ্গী ও বন্ধু হিসাবে দিনুবাবুর স্ত্রী কমলা ঠাকুর মেয়েদের খুব আপনার করে নিয়েছিলেন।

এখন থেকে শান্তিনিকেতন আমাদের একটা তীর্থস্থান হয়ে উঠল। যখনই আশ্রমে কোন উৎসব হত, তখনই আমরা দল বেঁধে বাবার সঙ্গে আশ্রমে যেতাম। নলিনী সরকার ও নীলিমা মহলানবিশ সর্বদাই আমাদের সঙ্গে যেতেন। যেতাম আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে, ফিরে আসতাম ম্লান মুখে। কেউ কেউ চোখের জলও ফেলত। তখনকার আশ্রম ছিল একটা অন্য জিনিস। অতিথিদের পয়সা খরচ করে খেতে হত না। বরং তাদের পেয়ে আশ্রম যেন ধন্য হয়েছে এইরকম করে আদর অভ্যর্থনা করা হত। একবার একটি অতিথি বালক রাত্রে শোবার জায়গা খুঁজে না পেয়ে রবীন্দ্রনাথের বিছানায় গিয়ে শুয়েছিলেন। অনেক রাত্রে শুতে এসে ঘুমন্ত বালককে নিজের বিছানায় দেখে তিনি অন্য ঘরে গিয়ে শুলেন।

প্রথম প্রথম আমরা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আমলকীকুঞ্জের মধ্যস্থিত নীচু বাংলায় উঠতাম। সেখানে তাঁর পুত্রবধূ হেমলতা দেবী এবং পৌত্রবধূ কমলা দেবী থাকতেন। পরে কমলা অন্য বাড়ীতে উঠে যান। আমাদের সঙ্গে দু-দিনেই এঁদের আত্মীয়তা হয়ে গেল। আশ্রমপতি ছাড়া আর একজনের আতিথ্যে ও ব্যবহারে আমরা মুগ্ধ হয়েছিলাম—তাঁর নাম সন্তোষচন্দ্র মজুমদার। ওরকম ভদ্র নম্র মার্জিতরুচি ও অতিথিবৎসল মানুষ বেশী চোখে পড়ে না। অতিথিদের জন্য কী পরিমাণ পরিশ্রম যে তিনি হাসিমুখে করতেন বলা যায় না। দুর্ভাগ্যক্রমে পৃথিবীর মায়া তিনি অল্প-বয়সেই কাটিয়ে চলে যান। তাঁর স্থান আর পূর্ণ হয়নি। ইনি ছিলেন কবির বন্ধু শ্রীশচন্দ্রের পুত্র।

শান্তিনিকেতনে যখন আমরা যেতাম তখন তাঁর রচিত কোন কোন গল্প রবীন্দ্র-নাথ আমাদের পড়ে শোনাতেন। একটি গল্পের নাম "তপস্বিনী" বোধহয়। স্বামী সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছেন মনে করে তপস্বিনীর বহু তপস্যার পর তাঁর স্বামী যখন অকস্মাৎ একদিন বিলাত থেকে মস্ত সাহেব হয়ে ফিরে এলেন তখন আমরা খুবই চমকিত হয়েছিলাম।

এই সময় মাঝে মাঝে অনেক মজার খেলা হত। তাকে বোধহয় 'শ্যারাড' বলে। সুকুমারবাবু সবচেয়ে বেশী মজা করতেন। একটা গল্পে তিনি সব কথাতেই বারে-বারে "আমার মেজমামা" বলে বাধা দিয়ে নিজের বক্তব্য বলতে গিয়ে সবাইকে হাসাচ্ছিলেন।

কলেজের জীবনের সঙ্গেই এইসব তীর্থযাত্রা চলছিল। তারই মধ্যে বি. এ. পাশ

করেছিলাম এবং কপালক্রমে "পদ্মাবতী" মেডাল পেলাম। খুবই আনন্দ হল; কিন্তু তারই কিছুদিন আগে দাদাকে বিলেত পাঠিয়ে দেওয়াতে বাড়ীটা বড়ই খালি হয়ে পড়ল। আমাকে স্কুলে চাকরী নিতে দুই-একজন বললেন, কিন্তু বাবা দিলেন না। তাতে একজন মন্তব্য করলেন, "মেয়েকে কি glass case-এ সাজিয়ে রাখবেন?" অগত্যা বেকার হয়ে বাড়ীতে বসে মায়ের সংসার সামলাতে লাগলাম। এই সময় ছাত্রসমাজ, যুবসমিতি প্রভৃতিতে মাঝে মাঝে প্রবন্ধ পড়তাম, 'প্রবাসী'র জন্য কিছু কিছু অনুবাদ করতাম। এই সময়েই বোধহয় দুই বোনে মিলে 'হিন্দুস্থানী উপকথা' অনুবাদ করেছিলাম। বছরটা ঠিক মনে নেই। 'প্রবাসী'তে অনুবাদ করতাম 'জগদ্দুর্লভ ভট্টাচার্য্য' নাম নিয়ে। কিছুদিন পরে ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়ে অবৈতনিক শিক্ষয়িত্রী হবার জন্য ডাক পড়ল। তখন সীতাও বি. এ পাশ করেছে।

বোধহয় লেডি বসুই আমাদের দুই বোনকে ডাকেন। তাঁর সঙ্গে কবে পরিচয় হয় মনে নেই। তবে আমরা যখন কলেজে পড়ি তখনই জগদীশচন্দ্র বাবার সঙ্গে আমাদের দুই বোনকেও মাঝে মাঝে তাঁর বাড়ীতে চা খেতে ডাকতেন। বাবার গুরু বলে উনি আমাদের নাতনী বলতেন। নন্দলাল বসুর ছবিতে অলঙ্কৃত তাঁর বসবার ঘরে অনেকবার গিয়েছি বড় বড় লোকদের মাঝখানে। প্রেসিডেন্সী কলেজে যখন তিনি বড় বড় বক্তৃতা দিতেন আমরা দুই বোন নিমন্ত্রণপত্র পেতাম ও খুব আনন্দের সঙ্গে বক্তৃতা শুনতাম। এর কিছুদিন পরেই বোধহয় ব্রাহ্মবালিকা স্কুলে যাওয়া শুরু করি। বেশীদিন পড়াইনি। সে সময় প্রিয়ম্বদা দেবীও ওখানে পড়াতেন। তাঁকে আনবার জন্য একটা ফিটন গাড়ী ভাড়া করা হয়েছিল। সেই গাড়ীতেই আমরাও যেতাম। দু-জনেই পড়াতাম।

ডিগ্রি নেওয়ার কথা আজও মনে আছে। ডিগ্রি নিতে যখন সেকালের থাম-ওয়ালা সিনেট হলে যাই, তখন আজকালকার মত পাইকারী দরে ডিগ্রি দেওয়া হত না। আমরা ভাইস্-চ্যান্সেলার আশুবাবুর হাত থেকে ডিগ্রি নিলাম। তিনি "I charge you.." বলে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন। আমার বুকটা ধড়াস করে উঠল।

স্কুলের কাজ ছাড়া আর একটা কাজ হল গান-বাজনা শেখা। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয় সমাজ মন্দিরের দোতলার গ্যালারীতে একটি ক্লাস খুলেছিলেন। তাতে তিনি এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শেখাতেন। সুরেন্দ্রবাবুর 'গীতলিপি' থেকেই গান শেখানো হত। তাছাড়া এস্রাজ বাজানো শিখতাম। ছাত্র মাত্র একজনই ছিলেন, বাকি কয়েকজন ছাত্রী। উপেন্দ্রবাবুর চেহারাও যেমন সুন্দর ছিল, কথা বলার ধরনও সেইরকম মোলায়েম ছিল। তাঁর কথা বলার বেশ একটা মিষ্টি সুর ও

accent ছিল; হাতের লেখায় একটা বিশেষত্ব দেখতাম—আগে লাইনটা লিখে নিতেন, তারপর যথাস্থানে ি, ী, ু, ৃ ইত্যাদিগুলি বসিয়ে দিতেন।

উনি আমাদের গানের ক্লাসের একটা উৎসবও একবার করেছিলেন সমাজ-মন্দিরে। তাতে আমরাই গান করেছিলাম, উপেন্দ্রবাবু বক্তৃতা করেছিলেন। একটা গান ছিল "জগৎ জুড়ে উদার সুরে আনন্দ গান বাজে।" অন্যান্য কিছু কিছু গানও ছিল, সব আজ মনে নেই। উপেন্দ্রবাবু আমাদের সংস্কৃত শ্লোক বলে বলে তাল শেখাতেন:

"অভূন্নৃপঃ বিবুধসখঃ পরন্তপঃ
শ্রুতান্বিত দশরথঃ ইত্যুদাহৃতঃ
গুণৈঃ বরং ভুবনহিতচ্ছলেন যঃ
সনাতনঃ পিতরমুপাগমৎ স্বয়ং ॥"

ভট্টিকাব্যের এই শ্লোকটা এখনও মনে আছে। কী কারণে জানি না ক্লাসটা কিছুদিন পরে বন্ধ হয়ে যায়। তারপর সঙ্গীতসঙ্ঘে কিছুদিন বাজনা শিখতে গিয়েছি। সেখানে আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের পত্নী প্রতিভা দেবীই বেশীরভাগ দেখাশুনা করতেন। অনেক নামকরা বাড়ীর মেয়েরা শিখতে আসতেন। কিন্তু সকলে সকলের সঙ্গে মিশতেন না, যে যার নিজের গণ্ডীর মধ্যেই থাকতেন। আমি ও নীলিমা মহলা-নবিশ সমাজপাড়া থেকে ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করে যেতাম। আমাদের যিনি বাজনা শেখাতেন তাঁর নাম বোধহয় ছিল শ্যামসুন্দরবাবু। সঙ্ঘে প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবীকেও প্রায় দেখতাম। এঁর রন্ধনবিদ্যা বিষয়ে 'আমিষ ও নিরামিষ আহার' বলে একটা বই ছিল। সঙ্গীতসঙ্ঘে তিনি স্কুল তদারক করতে আসতেন। অনেকগুলি ক্লাস ছিল।

দাদা বিলাত যাবার আগে ও পরে 'আবোল তাবোলে'র লেখক সুকুমার রায়ের সঙ্গে তাঁর খুব বন্ধুত্ব ছিল। সুকুমারবাবুদের একটা 'মণ্ডা ক্লব' ছিল। তাতে অবশ্য আমরা যেতাম না। কিন্তু মাঝে মাঝে উনি "শব্দকল্পদ্রুম", "অদ্ভুত রামায়ণ" প্রভৃতি নানা অভিনয় করতেন, সেগুলি আমরা খুব উপভোগ করেছি। তাঁর গান:

"ওরে ভাই, তোরে তাই কানে কানে কই রে,
ওই আসে, ওই আসে, ওই ওই ওই রে।"

মুলুদের খুব প্রিয় ছিল।

সুকুমারবাবু বিবাহ করেন আমার সহপাঠিনী ও বন্ধু টুলুকে। তারপর ওঁদের বাড়ীতে মাঝে মাঝে চায়ের নিমন্ত্রণে যেতাম। চিঠি আসত এইরকম:

"আসছে কাল শনিবার
অপরাহ্ণ সাড়ে চার
আসিয়া মোদের বাড়ী
শুভ পদধূলি ঝাড়ি
কৃতার্থ করিলে সবে, টুলু পুষু খুশী হবে।"

পুষু সুকুমারবাবুর ভ্রাতা সুবিনয়ের পত্নী।

কিছুদিন পরে আমরা দুইবোন বাবার সঙ্গে মুলুকে নিয়ে শান্তিনিকেতনে পড়াতে গেলাম। তার শরীর ভাল ছিল না, তাই আশা করা গিয়েছিল যে ওখানে পড়াশুনার সঙ্গে শরীরটারও তার উন্নতি হবে। মা বেশীরভাগ সময় ক্ষুদুকে নিয়ে কলকাতায় থাকতেন। সে সময় কলকাতায় Light Horse-এর একটা camp হয়েছিল। ক্ষুদু তাতে ভর্তি হয়েছিলেন, ভূপতি সেন প্রভৃতি বড়রাও অনেকে ভর্তি হয়েছিলেন।

ঠিক কোন্ বৎসর মনে নেই, তবে শান্তিনিকেতনে যাবার আগেই মুলু রামমোহন লাইব্রেরী হলে আশামুকুল নামে তার এক বন্ধুকে নিয়ে 'ডাকঘর' অভিনয় করেছিল। মুলু বোধহয় মোড়ল কিংবা পিসেমশায় হয়েছিল আর আশামুকুল অমল। অভিনয় খুব সুন্দর হওয়াতে রবীন্দ্রনাথের কাছে খবরটা পৌঁছয়। তাই তিনি তাঁদের জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে 'ডাকঘর' অভিনয়ের সময় আশামুকুলকে অমলের পার্ট দেন। গগনেন্দ্রনাথ পিসেমশাই সেজেছিলেন। তাই আশামুকুল তখন থেকে বরাবরই গগনবাবুকে পিসেমশাই বলে ডাকত। তিনি তাকে খুব ভাল বাসতেন। কতকটা মুলুর চেষ্টাতেই আশামুকুল পরে শান্তিনিকেতনে পড়ার সুযোগ পায়। মুলুর নাক-মুখ ভারি সুগঠিত ছিল, কিন্তু চুলগুলি ছিল সোজা সোজা। অল্প বয়সে সে খুব লম্বা হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ বলতেন "মুলু আশ্রমের তালগাছগুলির সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে।" মুলুর দলের ছেলেদের সুকুমারবাবুর রামায়ণের অনেক গানও খুব প্রিয় ছিল। তার মধ্যে একটা :

"রাবণ ব্যাটায় মার, সবাই রাবণ ব্যাটায় মার।
তার মাথায় ঢাল ঘোল, তারে উল্টো গাধায় তোল।
তার কাণের কাছে পিটতে থাক চোদ্দ হাজার ঢোল।"

চারুবাবুকে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "রামানন্দবাবুকে আমাদের এই আশ্রমে আবদ্ধ করবার জন্য বহুদিন থেকে সাধনা করছি।" স্বামীভাকে যাবার আগেই ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীষ্মের ছুটিতে তাঁরই আগ্রহে আমরা শান্তিনিকেতনে নেপালবাবুর কুটীরে

কিছুদিন ছিলাম। তারপর জুলাই মাসে ওখানে একটি মাটির বাড়ী কিনে আমরা নিজেদের ঘর-সংসার পাতলাম। ছোট বাড়ী, তিনখানা মাত্র ঘর, খড়ের চাল। চারদিকে বারান্দা, বারান্দারই কোণ ঘিরে একদিকে রান্নাঘর ও আর একদিকে স্নানের ঘর হল। বারান্দার কাঠের খুঁটিগুলি বদলে ইটের মোটা থাম হল, প্ল্যাস্টার চূণকাম কিছুই বাদ গেল না। বাড়ীর চারধারে লাল সুরকি ঢেলে বেশ ছবির মত দেখতে হল। আপনা থেকেই একটা পেয়ারা গাছ গজিয়ে উঠল। এই গাছটির কথা রবীন্দ্রনাথের একটা চিঠিতে আছে।

আমাদের বাড়ীর পরে একটা মাঠ, সেই মাঠের পরেই রবীন্দ্রনাথের বাসগৃহ দেহলি। আমাদের বাড়ী থেকে তাঁকে সর্বদাই দেখা যেত অর্থাৎ যদি তিনি উপর-তলায় দরজা খুলে থাকতেন। ভোরে আমরা বিছানা ছাড়বার অনেক আগেই তিনি পূর্বমুখে উপাসনায় বসতেন। তারপর সারাদিন নানা কাজকর্ম। খাবার সময় এক-তলায় নামতেন। একতলায় অনেক সময় মীরা দেবী থাকতেন। সন্ধ্যায় আবার উপরের ছোট ছাদটিতে কবি ক্যাম্প চেয়ারে বিশ্রাম করতেন। তখন আমরা এবং আরও অনেকে সেখানে গিয়ে হাজির হতাম। কতরকমের গল্প আর আলোচনা যে হত তার ঠিক নেই। তার মধ্যে থেকে থেকে শিশুরা এসে নানা আর্জি পেশ করে যেত। সে এক যুগ গিয়েছে যা কেউ আর কোনদিন ফিরে পাবে না। মনে পড়ে এই সময়ই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইল না, রইল না।"

ঐ বাড়ী থেকে মীরা দেবী অনেক সময় আমাদের বাড়ী বেড়াতে আসতেন। কিন্তু বিকালে দেহলির ছাদে তাঁকে কখনও দেখতাম না। প্রতিমা দেবী অনেক সময় আসতেন। কবি প্রতিমা, সীতা ও আমাকে তাঁর three graces বলতেন। আমাদের দিনকয়েক শেলি পড়িয়েছিলেন।

এই সময় রবীন্দ্রনাথ কিছুদিন স্কুলের ২।১ টা ক্লাসে ইংরেজী পড়াতেন। তাঁর পড়ানো শুনতে অনেক বড়রাও এসে উপস্থিত হতেন। বাবাও মাঝে মাঝে যেতেন। বাবাকে দেখে কবি একটু সংকুচিত হতেন। কলকাতা থেকে একবার অধ্যাপক জয়গোপাল মুখোপাধ্যায় গিয়ে ছেলেদের ক্লাসে বসলেন। রবীন্দ্রনাথের পড়াবার একটা নূতন পদ্ধতি ছিল।

দেহলির ছাদে নানা বিষয়ের মধ্যে "কাবুলীওয়ালা" "দুরাশা" "সমাপ্তি" প্রভৃতি অনেক ছোটগল্পের জন্মকথা আলোচিত হত। কবি বলতেন যে একসময় তাঁরা মুখে মুখে তিন-চারজনে মিলে গল্প রচনা করতেন। তারপর কেউ একজন একটা প্রকাণ্ড

সমস্যার সৃষ্টি করে রবীন্দ্রনাথের হাতে গল্পটিকে ছেড়ে দিতেন। কবির এইসব বন্ধুদের মধ্যে মহারানী সুনীতি দেবী প্রভৃতিও ছিলেন। শেষ পর্যন্ত কবিই তার উদ্ধারসাধন করতেন। মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথ আমাকে একটা ভূতের গল্প লিখতে বলতেন। নেপালবাবু বোধহয় আমার লেখা কোন গল্পের প্রশংসা তাঁর কাছে করেছিলেন। তখন আমরা সবে গল্প লেখা আরম্ভ করেছি। সীতা আর আমি তখন সংযুক্তা দেবী নাম নিয়ে 'প্রবাসী'তে "উদ্যানলতা" উপন্যাস লিখেছিলাম। ছাত্রছাত্রী মহলে উপন্যাসটির বেশ নাম হয়েছিল। পরেও অনেকে এ কথা বলেছে। কারণ আমাদের আগে স্কুল কলেজের মেয়েদের নিয়ে বাংলা গল্প কেউ লেখেনি। একজন গবেষক ইংরেজী একটা কাগজে এ কথা লিখেছেন। সংযুক্তা দেবীকে আবিষ্কার করবার জন্য তখনকার অনেক খ্যাতনামা লেখক লেখিকা নানা সন্ধান করেন। একবার বোধহয় মাঘোৎসবের সময় শারীরিক অসুস্থতার জন্য সুবিখ্যাত লেখিকা নিরুপমা দেবী একটু বিশ্রামের জন্য আমাদের বাড়ী এসে হাজির। আমরা সংযুক্তারা যে বয়স্কা মহিলা নই দেখে তিনি বিস্মিত ও পুলকিত হলেন। তারপর তাঁর বন্ধু লেখিকা হেমনলিনী দেবীর বাড়ী আমাদের নিমন্ত্রণ করলেন। হেমনলিনী 'নাইকা' বলে একটি গল্পের বই লিখেছিলেন। এই বাড়ীটা তাঁর ভাই কালিদাস পাণ্ডের বাড়ী। লেখিকা সম্মেলন হবে বলে সেখানে কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীকে আনা হয়েছিল, আমাদের দিয়েই কবি প্রিয়ম্বদা দেবীকেও যোগাড় করা হয়েছিল। গিরীন্দ্রমোহিনী পাশের একটা ঘরে বসে ছবি আঁকছিলেন দেখলাম। সকলে মিলে আমাদের খুব আদর আপ্যায়ন করলেন। কিছুদিন নিরুপমা চিঠিপত্রও লিখেছিলেন। তার অনেক পরে পার্ক সার্কাসে All India Women's Conference-এ তাঁকে দেখি। সেখানে সেদিন Divorce Bill পাশ করাবার চেষ্টা হচ্ছিল। আগেকার সেই হাস্যময়ী নম্র নিরুপমা দেবী আজ ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে এসেছিলেন। Bill পাশ হলে হিন্দুর সংসারে যে কী অনন্ত অকল্যাণ হবে রেগে রেগে বলেছিলেন।

শান্তিনিকেতনে থাকতে আমরা আশ্রমের মেয়েরা সবাই মিলে 'শ্রেয়সী' নাম দিয়ে হাতের লেখা একটা মাসিকপত্র বার করেছিলাম। আমাকেই সম্পাদনা করতে হত। উৎসাহদাত্রী ছিলেন হেমলতা দেবী, তিনি লেখাও দিতেন। মলাট একবার প্রতিমা দেবী এঁকেছিলেন, একবার আমার মা এঁকেছিলেন। আমার "শিক্ষার পরীক্ষা" গল্পটি আমি প্রথমে এই কাগজেই লিখি। পরে তা 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয় এবং হিন্দি, ইংরেজী, ফ্রেঞ্চ প্রভৃতি নানা ভাষায় অনূদিত হয়। দাক্ষিণাত্য থেকে কোন ভাষাতেও অনুবাদ হয়েছিল। 'শ্রেয়সী' বেরোলে দিনুবাবুদের চা-চক্রে সেটা

একবার হাতে হাতে ঘুরত। কেউ যে বিশেষ পড়তেন তা নয়, তবে কে কী লিখেছে দেখতেন এবং ঠাট্টা করবার কিছু পাওয়া যায় কিনা খুঁজতেন।

'শ্রেয়সী' নামটা বোধহয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের দেওয়া। আমাদের হাতের লেখা এই কাগজে বড়দের মধ্যে কিরণবালা সেনও লেখা দিতেন; আমার মা মনোরমা দেবীও একবার একটা লেখা দিয়েছিলেন। বাকি সব যাঁরা লিখতেন তাঁদের লেখিকা বলে আজ কেউ চিনবে না। এইরকম অখ্যাতনামাদের কাছ থেকে আমি মাঝে মাঝে লেখা আনতে যেতাম। একদিন দুপুর রৌদ্রে কার একটা লেখা নিয়ে ফিরছি, হঠাৎ শুনলাম দেহলির ছাদ থেকে রবীন্দ্রনাথ বলছেন, "শান্তা, এই দুপুর রোদে লেখা খুঁজে বেড়াচ্ছ? আমার কাছেও ত একবার আসতে পারতে। আমি কি শ...এর চেয়েও খারাপ লিখি?" তিনি একটি তরুণী বধূর নাম করলেন। একবার কবিতার অভাবে আমি নাম না দিয়ে একটা কবিতা লিখেছিলাম। সেটা পড়ে রবীন্দ্রনাথ হেমলতা দেবীকে বললেন, "এ যে দেখি পাকা হাতের লেখা।" আমরা কলকাতা চলে আসার পর এই 'শ্রেয়সী' ছাপার অক্ষরে কিছুদিন বেরোত।

আশ্রমে এসেই মুলু খুব নানা কাজে মেতে উঠেছিল। সভা সমিতি, রান্না খাওয়া তদারক, যখন তার যা কাজের ভার থাকত, সব মন দিয়ে করত। পড়াশুনা ত ছিলই, তার উপর আবার সে এবং তার বন্ধু বিজয় বাসু প্রভৃতি মিলে ভুবনডাঙায় ছেলেদের জন্য একটা নাইট স্কুল করেছিল। বাবা এবং রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে পুরানো খবরের কাগজ নিয়ে তারা বাজারে বিক্রী করে ছাত্রদের সেই পয়সা দিয়ে বই-স্লেট-খাতা-পেনসিল কিনে দিত। মাঝে মাঝে আবার তাদের ঘটা করে আমাদের বাড়ীর সামনে খাওয়ানো হত। খাওয়া শেষ হলে ছেলেরা "ওয়া মনোরমা দেবীজি কী ফতে" বলে জয়ধ্বনি দিয়ে যেত।

একবার আশ্রমের আনন্দমেলায় মুলু "সীতা দেবীর চরণরেণু", "রামের পাদুকা", "ভীমের গদা" প্রভৃতি পৌরাণিক জিনিসের একটা প্রদর্শনী করেছিল আধুনিক জগৎ থেকে সংগ্রহ করে। তারপর থেকে বহুদিন আশ্রমের ছেলেরা এইরকম পৌরাণিক দ্রব্যের প্রদর্শনী করে এসেছে।

কিন্তু মুলুকে আমরা বেশীদিন ধরে রাখতে পারিনি। আমরা বছর দুই শান্তিনিকেতনে থাকার পর কলকাতায় মা প্রায় সকলকে ছেড়ে থাকাতে তাঁর শরীর মন দুই খারাপ হতে লাগল। ডাক্তারেরা বললেন, "আপনারা সকলে এক জায়গায় থাকলে ওঁর উন্নতি হবে মনে হয়।" অগত্যা আমরা কলকাতায় ফিরে এলাম। মুলুকে এখানকার স্কুলে ভর্তি করা হল। দাদাও এই সময় প্রায় সাত বছর পরে

দেশে ফিরে এলেন বিলেত থেকে। মায়ের মুখে হাসি দেখা দিল। কন্যার মাতারা অনেকে এসে দাদাকে জামাই করবার ইচ্ছা প্রকাশ করতে লাগলেন। এমনি করে দিন কাটছিল, বেশী দিন যায়নি। দাদা ফিরে আসার মাস দুই পরে মুলু একদিন খেলতে খেলতে পড়ে গিয়ে কোথায় যেন লাগাল। ব্যথাটা কিছুই না, কোথায় তা-ও বলতে পারল না। একেবারে ১০৫° জ্বর এল। বাড়ীর ডাক্তার বড় ডাক্তার আনতে বললে। নীলরতনবাবু অসুস্থ ছিলেন, তাঁকে পাওয়া গেল না। যাই হোক, যাঁরা এলেন তাঁরা রক্ত দিতে বললেন। ক্ষুদ্র রক্ত নিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু ফল হল না। চার-পাঁচ দিনেই মুলু সকলের বুক ভেঙে দিয়ে চলে গেল। মা একেবারে চিরকালের মত ঘর সংসার সমাজ সব ছেড়ে দিলেন। আগের মত সহজ হাসি আর তাঁর মুখে কেউ দেখল না। বাবা অমল হোমকে লিখেছিলেন, "সেই পূর্বের মত দিন আমার জীবনে আর আসবে না।"

ঠিক কোন বছরে মনে নেই, তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে একদিনের জন্য ভর্তি হবার আগে সীতা ও আমি বাড়ীতে চারুবাবুর কাছে ফ্রেঞ্চ পড়া শুরু করেছিলাম। বেশ খানিকটা এগিয়েছিলাম। দু-চারটে গল্প বাংলায় অনুবাদ করে 'প্রবাসী'তে ছাপিয়েছিলাম। যখন University-তে ভর্তি হই তখন প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মহাশয় আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন আমার ফ্রেঞ্চ পড়ার বিষয়ে। তাইতেই বুঝলাম তিনি 'প্রবাসী'তে আমাদের অনুবাদ দেখেছিলেন। ফ্রেঞ্চ পড়া কিছুদিন পরে বন্ধ হয়ে গেল। তার অনেকদিন পরে যখন বিশ্বভারতী একটু একটু করে শুরু হচ্ছে তখন আমি কয়েক মাসের জন্য ওখানে ছবি আঁকা শিখতে গিয়েছিলাম। ওখানে জলরঙা ছবির সঙ্গে আর কী কী শেখা যায় তার ব্যবস্থা করছিলাম। এইসময় শ্রীমতী আঁদ্রে কার্পেলেস্ আশ্রমে এসেছিলেন। তাঁর কাছে আমি তৈলচিত্র ও কাঠখোদাই চিত্র শিক্ষা শুরু করি এবং অধ্যাপক বেনোয়া (ফরাসী) মহাশয়ের ফ্রেঞ্চ ক্লাসেও ভর্তি হই। বেশ খানিকটা আবার পড়লাম। মিস্ গ্রীন নাম্নী একজন আমেরিকান মহিলা তখন ওখানে ছিলেন, তাঁর কাছে কেক্ তৈরী শিখতাম। রবীন্দ্রনাথ আমার এইরকম সর্ববিদ্যাবিশারদ হবার চেষ্টাকে বেশ ঠাট্টা করেছিলেন। কিন্তু আমি দমিনি। কপালদোষে কলকাতায় বাড়ীতে মায়ের অসুবিধার জন্য আমাকে ফিরে আসতে হল। তার অল্পদিন পরেই সীতার বিবাহ হয়ে গেল। আমার আর আশ্রমে যাওয়া হল না। সীতা স্বামীর সঙ্গে রেঙ্গুনে চলে গেল। শেষবার যখন আশ্রম থেকে ফিরছিলাম তখন হাওড়া ষ্টেশনে একটা কুলি আমার একটা বাক্স খুব ভারি দেখে নিয়ে কোথায় যে উধাও হয়ে গেল জানি না। বাড়ী ফিরে দেখলাম বাক্সভর্তি

আমার যত ফ্রেঞ্চ বই অভিধান আর রবীন্দ্রনাথের ম্যাকমিলানের বই ছিল। কুলির কতটা লাভ হল জানি না। আমার বাড়ী বসে ফ্রেঞ্চ পড়ার উপায়ও রইল না।

১৩২৪ সালে যখন শান্তিনিকেতনে বাস করতে যাই, তখন ওখানে কৃতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথমা পত্নী সুকেশী থাকতেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন, কিন্তু নিজের ভাসুরের ছেলেকে মানুষ করেছিলেন। সুকেশী দেবী খুব মিশুক ছিলেন এবং নানা-রকম মজা করে গল্প করতেন। একবার তিনি বিলাত প্রবাসী এক নামকরা বরের সঙ্গে সীতার সম্বন্ধ এনেছিলেন, বললেন, "তার কিন্তু দুটি মেয়ে আছে।" সীতা যেই বলেছে, "ও বাবা।" অমনি সুকেশী দেবী বললেন, "তোমার জন্যে কি তারা মরবে নাকি?" মেয়েদের আধুনিক পোষাক, প্রেমে পড়া সব নিয়েই তিনি নানা হাসির গল্প করতেন। সব গল্পই কাগজে কলমে লেখবার মত নয়। ১৯১৮ কি ১৯শে যখন একটা influenza মহামারী হয়, সেই সময় শান্তিনিকেতনে অনেকের সঙ্গে সুকেশী দেবীও পীড়িত হন। তিনি রোগ থেকে সেরে উঠতে পারলেন না। সুন্দরী সুরসিকা সুকেশী আত্মীয়বন্ধুদের বেদনা দিয়ে অকালেই চলে গেলেন। চারিধারে যেন মৃত্যুর একটা ছায়া ঘুরে বেড়াত মনে হত। অজিতকুমার চক্রবর্তীও এই সময় গেলেন। এই ১৯১৯ সালেই মুলুকেও আমরা হারালাম।

এরপর আমাদের সংসারে ধীরে ধীরে অনেক পরিবর্তন হয়ে গেল। ক্ষুদু বি. এ. পাশ করার পর কেমব্রিজে পড়তে চলে গেলেন। বছর দুই-তিন তাঁর সেখানেই কাটল। ক্ষুদু বাড়ী ফিরে আসবার আগেই দাদার বিবাহ হয়ে গেল ডাঃ নীলরতন সরকার মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যার সঙ্গে। নূতন বউ আসবেন বলে কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের এতদিনের বাসা ছেড়ে আমরা রাজা রামমোহন রায় রোডের একটা নূতন বাড়ীতে উঠে গেলাম। 'প্রবাসী' আপিস রইল কর্নওয়ালিস স্ট্রিটেই।

আমাদের সেই ছেলেবেলার পরিচিত সংসার প্রায় সকল দিক দিয়েই বদলে গেল। কোথায় গেল ক্ষুদু মুলুর কলরব আর গান, কোথায় গেল মায়ের হাতের মিষ্টি রান্না? প্রতি জন্মদিনে আর ভাইফোঁটায় ক্ষুদু কী উপহার পাবে তার জন্য দিদিদের কাছে canvas করত, সে এখন Cantab হয়ে আসবে। দিদি ছাড়া সীতার এক মিনিট চলত না, সে পরের গৃহিণী হয়ে বিদেশে চলে গেল। বাবাও অসুস্থ হয়ে কিছুদিন গিরিডিতে শরীর সারাতে গেলেন। বাবার অসুস্থতাটা প্রধানত মানসিক বেদনা থেকেই হয়েছিল।

সীতার বিবাহের কিছুদিন আগে যখন একলা ছবি আঁকা শিখতে আশ্রমে গিয়েছিলাম তখন মিসেস লটি সেন মেয়েদের বোর্ডিঙের ভার নিয়েছিলেন। সেখানেই

আমি একটা ছোট ঘর একলা পেয়েছিলাম। বাড়ীটার নাম ছিল 'লেবুকুঞ্জ'। ছবির ক্লাশে গিয়ে একটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ হল, তিনি কৃতীবাবুর দ্বিতীয়া পত্নী সবিতা দেবী। ইনি ভাল আঁকতেন এবং ভাল নাচতে পারতেন। বোর্ডিঙের বাড়ীতে লেবুকুঞ্জের আর একটা ঘরে তটিনী দাস এসেছিলেন। তিনি ওখানে লেজনি ও উইণ্টারনিৎস সাহেবের কাছে মোটা মোটা বই নিয়ে পড়াশুনা করতেন। তাঁর স্বামী সরোজবাবুও প্রতি সপ্তাহে একবার আসতেন, বিশ্বভারতীতে কিছু পড়াতেনও বোধহয়। তটিনীর সংসারের বেশীরভাগ কাজই সরোজবাবু করে দিতেন, খুব কাজের লোক ছিলেন। এই সময় ফণীভূষণ অধিকারীর কন্যা আশা অধিকারী আশ্রমে ছিলেন। ভারী সরল স্বভাবের মেয়ে। কয়েক বৎসর পরে তিনি আর্যনায়কম্‌কে বিবাহ করেন। আর্যনায়কম্ আগে খৃষ্টধর্মী ছিলেন। শান্তিনিকেতনে বাবা একবার পীড়িত হয়ে পড়ায় ইনি বাবার সেবা করেছিলেন মনে আছে। বাবাই এঁদের বিবাহ দেন।

বিশ্বভারতীর প্রথম যুগে অশোক ও কালিদাস নাগ কলকাতা থেকে প্রতি সপ্তাহে ওখানে পড়াতে যেতেন। তখনই প্রফেসর লেজনি ও উইণ্টারনিৎস প্রভৃতি এখানে পড়াতে এসেছিলেন।

আমার বিবাহের পর আমি রামমোহন রায় রোড ছেড়ে দীনেন্দ্র স্ট্রিটের একটা ভাড়াবাড়ীতে যাই। মাকে দেখতে প্রতিদিন আসতাম রামমোহন রায় রোডে। মা রাঁধুনীর রান্না খেতেন না বলে হয় নিজেই রাঁধতেন, নয় আমি রান্না করে দিতাম। আমার বিবাহের আগেই অশোক বিলেত থেকে ফিরে আসেন। এখানে এসে অশোক *Welfare* বলে একটা কাগজ বার করেন এবং প্রধানত অশোকের চেষ্টাতেই সার্কুলার রোডে 'প্রবাসী'র নিজস্ব প্রেস স্থাপিত হয়।

এতদিনে সীতা ও আমি বাংলা গল্প ও উপন্যাস লেখায় অনেকটা এগিয়ে ছিলাম। সংখ্যায় সীতা আমার চেয়ে অনেক বেশী লিখতেন এবং এখনও মাঝে মাঝে লেখেন। আমি কোনদিনই অত দ্রুত কলম চালনা করতে পারি না।

বিবাহের আগে মাঝে কিছুদিন ছবি আঁকায় খুব মন দিয়েছিলাম। নন্দলাল বসু ও অবনীন্দ্রনাথ দু-জনের কাছেই কিছু কিছু শিখেছিলাম। দু-তিনটা ছবি বিক্রীও হয়েছিল এবং কয়েকটা প্রদর্শনীতে গিয়েছিল। আমার মায়ের একটা পেন্‌সিল স্কেচ করেছিলাম, সেটা O. C. Gangoly-র ভাল লেগেছিল বলে তিনি 'রূপম্' কাগজে ছেপেছিলেন। তখন আর্ট সোসাইটির হলে নিয়মিত প্রদর্শনী হত। হলটি দিশী ভাবে সাজানো থাকত। অবনীবাবু বলতেন, "যখন আমাদের জোর ইণ্ডিয়ান আর্টের চর্চা

চলছে তখন ভাবলুম সব দিকেই এর চর্চা করতে হবে।" দিশী আসবাব দিয়ে দিশী ঘরদোর এমন কি আর্ট সোসাইটির হল্‌ও তাঁরা দুই ভাই সাজিয়েছিলেন। নিজেদের বাড়ীর পুরাতন মূল্যবান আসবাব বিক্রী করে ফেলে নিজেরা দেশী নমুনা দিয়ে নূতন আসবাব করতে শুরু করলেন।

জোড়াসাঁকোয় তাঁদের বড় ঘরের মেঝেতে তখন জাপানী মাদুরের গদি পাতা থাকত। দেয়ালে সবচেয়ে চোখে পড়ত তাঁর আঁকা "পদ্মপত্রে অশ্রুবিন্দু" এবং তাঁর মাতৃদেবীর ছবিটি। মোগল আর্টের ছবিতে দেয়াল ভর্তি। দাক্ষিণাত্যের পিতলের বড় বড় প্রদীপাধার ঘরে ও বারান্দায় সাজানো, মাঝে মাঝে চীনা কি জাপানী টবে বামন মহীরুহ। তিনখানি চেয়ারে এইখানেই তিন ভাই বসতেন। গগনেন্দ্র তখন বেশীরভাগ কার্টুন আঁকতেন, অবনীন্দ্র জলরঙের ছবি। ছবি আঁকতে আঁকতে তিনি তাঁর সাদা পাঞ্জাবীতে তুলি মুছতেন। এইখানেই সব বাইরের লোকেরা তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। অনেক সময় ছবির থেকে চোখ না তুলেই তিনি তাঁদের সঙ্গে কথা বলতেন। আমি তাঁর কাছে ছবি দেখাতে বাবার সঙ্গে ঘোড়ার গাড়ীতে চড়ে যেতাম। যখনই যেতাম দেখতাম তিনি ওই দক্ষিণের বারান্দায় ছবি আঁকছেন। ঐ সময় তাঁর আঁকা চীন পরিব্রাজকের একটি ছবি তিনি আমাকে দিয়েছিলেন। তাঁদের বসবার ঘরে তাঁর মায়ের যে ছবিটি ছিল তা মা জীবিত থাকতে আঁকা নয়। তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর কোন ছবি আঁকা বা ফোটো তোলা হয়নি শুনেছি। পরে অবনীবাবু নিজের মন থেকেই এই ছবিটি এঁকেছিলেন। একদিন দেখলাম, তিনি শ্বেতপাথরের একটি ভাঙা থালা নিয়ে ছোট বাটালি দিয়ে কী খোদাই করছেন। ধীরে ধীরে সেটি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি হয়ে উঠল। এটিও দ্বিজেন্দ্রনাথকে না দেখেই করা। অবনীবাবু বলতেন, "আমরা অধিকাংশ জিনিষই ভাল করে দেখি না। ছবি আঁকবার আগে দেখতে শেখা দরকার। গোলদীঘির ধারে যে রোজ বেড়ায় তাকে যদি জিজ্ঞাসা কর, ওখানের রেলিঙের ডিজাইনটা কীরকম, সে বলতে পারবে না।"

আমাকে অবনীন্দ্র প্রায়ই বলতেন, "আর্টিস্ট আর সাধারণ মানুষে প্রভেদ এই যে আর্টিস্ট দেখে, সাধারণ মানুষ দেখে না।" আমরা যে আমাদের আত্মীয়-বন্ধু-জনের মুখও মন থেকে আঁকতে পারি না, তার কারণ আমরা তেমন ভাল করে দেখি না। জিজ্ঞাসা করলে তার ভুরু চোখ নাক ঠোঁটের বর্ণনা সঠিক দিতে পারি না। আমরা বই পড়ি, কিন্তু অক্ষরগুলো সমস্ত দেখি না, অর্ধেক আন্দাজে পড়ে যাই।

জলরঙের wash দেওয়া, একটানে চুল আঁকা এই সব করে আমাকে দেখাতেন।

বলতেন, "ভোঁতা তুলি দিয়ে চুলের লাইনগুলি ভাল আঁকা যায়।" নূতন আর্টিস্টরা বড় রং নষ্ট করে বলে দুঃখ করতেন। আবার বলতেন, "কাগজ তুলি রংকে ভয় পেতে নেই। গেলই বা একটা ছবি নষ্ট হয়ে, যা চাও সাহস করে আঁকতে চেষ্টা কোরো।" একবার আমি একটা ছবি নিয়ে যাওয়াতে বলেছিলেন, "হয়েছে বটে, তবে একটা নয় দুটো ছবি।" এই বলে একজন নামকরা আর্টিস্টের গল্প করলেন: "সে আমাকে ছবি দেখাতে এনেছিল। আমি একটা কাঁচি এনে ছবির মাঝখান দিয়ে কেটে দিয়ে বল্লুম—এইবার হয়েছে।" সমস্ত ছবিখানির গতির দিক যে একমুখী হওয়া উচিত, তার রসের উৎসও যে একই কেন্দ্রে এই কথাই তিনি বোঝাতে চাইলেন।

কত সময় দেখতাম অবনীবাবু সুন্দর আঁকা ছবিকে জলে ডুবিয়ে ঘসে ঘসে রং তুলে দিচ্ছেন। আমি ভাবতাম গেল বুঝি ছবিটা। উনি জল থেকে টেনে তুলে বলতেন, "এইবার ঠিক effect হয়েছে।"

গগনেন্দ্র সমরেন্দ্র অবনীন্দ্র তিন ভাইকেই অভিনয় করতে দেখেছি। অবনীন্দ্র ছবিতে মানুষের মনের স্নেহ প্রেম করুণা প্রভৃতি গভীর রস ফুটিয়ে তুলতেন, কিন্তু অভিনয়ে তাঁকে হাস্যরসটাই সবচেয়ে বেশী খোরাক দিত। গগনেন্দ্র আঁকতেন কার্টুন বেশী, কিন্তু অভিনয়ে রাজোচিত গাম্ভীর্যটাই তাঁকে মানাত। 'ফাল্গুনী' অভিনয়ে অবনীন্দ্র শ্রুতিভূষণ সেজেছিলেন। তাঁর গলায় মালা ও হাতে পুঁথি, তাঁর পুঁথি পড়ার ভঙ্গীর সঙ্গে অনবদ্য হয়েছিল। এখনও মনে পড়ে "ওহে মূর্খ, ইহা দেখি শিক্ষ, ফল দিয়া রক্ষা পায় বৃক্ষ" তিনি কী সুরে বলেছিলেন। এই অভিনয়ে পিয়ার্সন সাহেবের একটি ভূমিকা ছিল। বোধহয় সেনাপতি সেজেছিলেন।

হাস্যরসাত্মক অভিনয়ে অবনীন্দ্রের মন বেশী খুলত বলে 'বৈকুণ্ঠের খাতা'য় তিনি তিনকড়ি সেজেছিলেন। তাঁকে দেখে তাঁর মা বলেছিলেন, "তুই একি লক্ষ্মীছাড়া সাজ করেছিস্।" অবনবাবুর সঙ্গে সুকুমার রায়ও এই অভিনয়ে একবার নেমেছিলেন। তাঁরা কিছু কিছু স্বরচিত কথা ঢুকিয়ে পরস্পরকে ঠকাবার চেষ্টা করছিলেন।

সে সময় দেশে ভাল কাঠ পাওয়া যেত, তখন অনেক বাড়ীতে বার্নিশবর্জিত মোমপালিশের আসবাব করার চলন হয়েছিল। অবনবাবুদের বাড়ীতেই আমি প্রথম রংহীন সেইরকম আসবাব দেখেছিলাম। অবন ও গগনবাবুরাই ডিজাইন করতেন আর তাঁদের ধনকোটি বা আচারি নামের একজন মিস্ত্রী সেগুলি তৈরী করত। মাটিতে বসে ছবি আঁকবার জন্য সে একরকম ডেস্ক করত। এখনও বোধহয় শান্তি-নিকেতনে সেইরকম ডেস্ক কিছু আছে। ঐ মিস্ত্রী আমার জন্যও একটি ডেস্ক করে দিয়েছিল।

মূলু মূর্তি গড়তে ভালবাসত, কিন্তু তাকে কিছু শেখানো হয়নি, শেখাবার অবসরও মেলেনি। তাই বাবা আমাকে ছবি আঁকতে শেখাতে চাইলেন। তিনি কিছুদিন নন্দলালবাবুকে আমার জন্য শিক্ষক রেখেছিলেন। সেটা অবনবাবুর কাছে শিখতে যাবার আগে। নন্দলালবাবু কতদিকে আমার দৃষ্টি খুলে দিয়েছিলেন যা আগে কখনও ভাবিনি। প্রকৃতির সমস্ত জিনিষই যে একটা ধরাবাঁধা নিয়মে চলে আগে তা ভাবতাম না। আমরা ভাবি গাছ এলোমেলো যেদিকে খুশি বাড়ে, কিন্তু তা নয়, তাদের কয়েকটা নির্দিষ্ট রূপ আছে, তারা তাই মেনে চলে—কোনটা গোলাকার, কোনটা ত্রিভূজাকৃতি, কোনটা স্বচ্যগ্র, কোনটা মোটা মাথা এইরকম। কাঠ, পাথর, ধাতুর জিনিষ সবের নিজস্ব character আছে। এইরকম নানা জিনিষ তিনি বোঝাতেন এবং সেই বুঝে আঁকতে বলতেন। অজন্তার ড্রয়িং নকল করতে দিতেন কিন্তু নিজস্ব ছবি মন থেকে compose করতে বলতেন। তাঁর কাছে অল্পদিন শেখার পরই তিনি শান্তিনিকেতনে চলে যান। কিছুদিন শিক্ষা বন্ধ রইল। সেই সময় একদিন Art Society-র প্রদর্শনীতে গগনবাবু বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "মেয়েরা ছবি টবি আঁকে?" বাবা বললেন, "চেষ্টা করে! নন্দলালবাবুর কাছে আঁকত; তিনি ত এখন শান্তিনিকেতনে।" গগনবাবু বললেন, "অবনের কাছে নিয়ে যাবেন।" তারপর অবনবাবুর কাছে অনেকদিন গিয়েছি, আরো কিছু শিখেওছিলাম। নিজের সময়ের অভাবেই সে চর্চাতে মর্চে পড়ে গিয়েছে।

কলকাতায় একবার একটা প্রদর্শনী হয়েছিল পোড়াবাজারে। নামেও পোড়াবাজার কাজেও পোড়াবাজার! ওই প্রদর্শনীতে আমি অনেকগুলি ছবি দিয়েছিলাম। আগুন লেগে প্রদর্শনী পুড়ে যায়। অন্যদের সঙ্গে আমার ছবিগুলিও অগ্নিদেব গ্রাস করলেন। এইরকম অঘটন আরো ঘটেছিল। গগনবাবু একবার জাহাজ করে ইউরোপে কোথায় যেন ছবি পাঠান। আমার দুটি অয়েল পেন্টিং তাঁর ভাল লেগেছিল। আশ্রমের মাটির ঘরের দৃশ্য। গগনবাবু বললেন, "ঐ দুটি দাও।" ছবি দিলাম। বোধহয় জাহাজডুবি হয়ে এবার সব ছবি জলগর্ভে চলে গেল। বাইরে যা ছবি পাঠাতাম তার মধ্যে রেঙ্গুনে পাঠানো ছবিগুলি ফিরে আসে এবং সেই সঙ্গে আসে একটি bronze medal পুরস্কারস্বরূপ। একসময় ভাবতাম আমি হয়ত ভাল artist হতে পারব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই হল না। মনে করে খুশি হই যে কোন কোন ছবির জন্য সমঝদারদের প্রশংসা পেয়েছিলাম। অথচ এখন সামান্য একটা ছবিও আঁকতে পারি না।

বিশ্বভারতীর শৈশবকালে কয়েক মাস শান্তিনিকেতনে ছিলাম প্রধানত ছবি

আঁকা শিখতে। আইন কানুন তখনও বিশেষ তৈরী হয়নি। আশ্রমপতির ইচ্ছাতেই বিশ্বভারতীর নানা বিভাগ চলত। বিভাগগুলি এত ছাঁটা কাটা ছিল না। একই মানুষ নানা বিভাগের ছাত্র হয়ে এবং অন্য কাজ করেও সেখানে শিক্ষা এবং আনন্দ-লাভ করতেন। কলাভবন নামটা তখন চলতি হয়েছিল কিনা মনে নেই। তবে ছবি আঁকার ক্লাশ হত। পিয়ার্সন সাহেবের বাংলোর দোতলায়। সেটা বোধহয় ১৩২৮ কি ২৯ সালে। একটি ছোট আর একটি বড় ঘরে ক্লাশ বসত। বড় ঘরটি ছেলেদের আর ছোটটি মেয়েদের। তার কাছেই লেবুকুঞ্জেই আমাদের বাসস্থান ছিল। সকালে উঠেই নিজের তৈরী ডিমের ওমলেট খেয়ে চলে আসতাম। সারাদিনই প্রায় সেখানে কেটে যেত। তখন এক টাকায় ছোট এক টুকরি ডিম পাওয়া যেত। শ্রীমতী হাথি-সিং ছিলেন তখনকার একজন ছাত্রী। আর যে সব মেয়েরা আসতেন তাদের মধ্যে শুধু আর্টের চর্চা নিয়ে থাকতেন এমন প্রায় কেউ ছিলেন না বলা চলে। শ্রীমতী একটা ছোট বাড়ীতে এই উপলক্ষেই নিজের একলার সংসার পেতে থাকতেন। সবিতা ঠাকুর তাঁর সাংসারিক কাজের উদ্বৃত্ত সব সবসময়ই আর্টের পিছনে ঢালতেন। অল্প-বয়সী মেয়েদের মধ্যে নন্দলালবাবুর কন্যা গৌরী ও যমুনা এবং সন্তোষবাবুর ছোট বোন বাসুকে মনে পড়ে। তাঁরা এই সঙ্গে শিক্ষাভবন বা পাঠভবনে পড়াশুনা করতেন। পড়ার ক্লাশের ফাঁকে ফাঁকে অকস্মাৎ আঁকার ক্লাশে তাঁদের আবির্ভাব হত। শ্রীযুক্তা কিরণবালা সেনের ছবি আঁকার দিকে ঝোঁক ছিল। কয়েকদিন অন্তর অন্তর একখানা ছবি নিয়ে ব্যস্তভাবে এসে হাজির হতেন। এখনও মনে পড়ে প্রদীপ হাতে একটি মেয়ের ছবি নিয়ে তাঁকে দিনকয়েক দেখতাম। তাঁর সময় ছিল কম, কিন্তু আঁকবার ইচ্ছা ছিল জোরালো। কিছুদিন পরে 'প্রবাসী'তে তাঁর আঁকা "ঘরে বাইরে" নামের একটি ছবি দেখি।

আমাদের ক্লাশ নিতেন নন্দলালবাবু। আগের মতই প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ সম্বন্ধে অনেক কথা বলতেন, যা এখনও মনে আছে। যদি সংসারের তলায় তলিয়ে না যেতাম, ঐ পর্যবেক্ষণের দীক্ষা বড় কোন কাজে দিয়ে যেতে পারতাম। পৃথিবীর নানা ঐশ্বর্যের ভিতর যে রেখা ও রঙের ছন্দ অনুক্ষণ নানাভাবে ফুটে আছে এবং ফুটে উঠছে, তা দেখবার শক্তি অল্পদিনেই কিছু লাভ করেছিলাম, কিন্তু পরে নানা তুচ্ছতার ধোঁয়ায় সে দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে গেছে মনে করে দুঃখ পাই।

মাস্টারমশায়ের তখনকার দিনের ছাত্রেরা অনেকে জীবনে কৃতিত্ব ও খ্যাতি অর্জন করেছেন। তার মধ্যে বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছিলেন রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। বিনোদ-বিহারী মুখোপাধ্যায়ও সে সময় আশ্রমে ছিলেন মনে হচ্ছে। যতদূর মনে পড়ে

ছেলেদের ক্লাসে দেখতাম রমেন্দ্রনাথ, প্রভাতমোহন, মণীন্দ্রভূষণ, ধীরেন্দ্র দেববর্মা, ভি. মাসোজি এবং আরও কয়েকজন। তখন ছেলেরা এবং মেয়েরা আলাদা শিখতেন, কারও সঙ্গে কারুর পরিচয় বিশেষ হত না। দুই-একজন আপনা থেকেই পরিচয় করে নিতেন মাঝে মাঝে।

তখন একটা কারখানা ঘর হয়েছিল প্রতিমা দেবীর বিশেষ আগ্রহে। সেখানে বই বাঁধানো, কাঠের পুতুল তৈয়ারী ও রং করা এবং নানারকম সেলাই প্রভৃতি হত। মাসিমা বলে পরিচিতা একজন মহিলা আলপনা ও সেলাইয়ে পাকা ছিলেন। এঁর নাম সুকুমারী দেবী। কাঠের উপর সুন্দর রঙে গালার কাজ নন্দলালবাবুও করতেন, ছাত্ররা শিখে নিত। এই সময় থেকে ধীরে ধীরে ভারতীয় নক্সা ও সেলাইয়ের ফোঁড় দেশে আবার চলতে থাকে। আগে বাংলাদেশে অন্তত সবাই বিলাতী ধরনে ছুঁচের কাজ করত। কিছুদিন কাঠোয়ারী কাজের খুব চলন শান্তি-নিকেতন ও কলকাতায় চলেছিল। কসিদার কাজ এবং কাশ্মীরী কাজও অনেকে তখন শিখত।

স্মৃতিকথা লিখতে গেলে অনেক সময় আগের কথা পরে এবং পরের কথা আগে মনে হয়। অবনীন্দ্রনাথের কথা বলতে বলতে রবীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়ছিল। আমাদের কলকাতার বাসার পাশে শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে 'দেবালয়' ছিল, সেখানে একবার রবীন্দ্রনাথ একটি প্রবন্ধ পড়তে এসেছিলেন। সে বোধহয় বাংলা ১৩১৬ সাল। আমরা ছুটলাম তাঁকে দেখতে। আমার জীবনে এই তাঁকে দ্বিতীয়বার দেখা। এবার সম্পূর্ণ স্বদেশী পোষাক। 'দেবালয়ে'র ঘরটি ছোট, কাজেই বাইরের গলিতে ও সমাজের প্রাঙ্গণে প্রচুর লোক এসে জমে গেল। গলি ও প্রাঙ্গণের মাঝ-খানে একটা দেয়াল লোকদের দৃষ্টিকে বাধা দিচ্ছিল, কিন্তু উপায় কি? প্রবন্ধ পড়ার পরেই শ্রোতাদের গানের অনুরোধ আরম্ভ হল। কবি বোধহয় সঙ্গে গানের খাতা নিয়েই ঘুরতেন। তখনই খাতা খুলে "মেঘের পরে মেঘ জমেছে" গান ধরলেন। গানের শব্দে আরও প্রচুর লোক ভীড় করে এল। বোঝবার বয়স হবার পর এই তাঁকে প্রথম দেখা। এলাহাবাদে যখন দেখি তখন আমরা শিশু। মানুষের চেহারা যে এমন সুন্দর হতে পারে এবং তদুপরি আবার এমন কণ্ঠস্বর, আগে তা কখনও ভাবিনি। শুভ্র ধুতি পাঞ্জাবী চাদর পোষাক কিন্তু নিখুঁত। ছেলেবেলা ৫।৬ বছর বয়সে এলাহাবাদে তাঁকে যখন আমাদের বাড়ীতে দেখেছিলাম তখন তিনি মোগলাই পোষাকে আসেন।

এর ২।১ বছর আগেই আমরা কলকাতায় আসি এবং তখন 'গোরা'র কপি নেওয়া ও প্রুফ দেওয়ার জন্য শান্তিনিকেতনে লোক ছোটাছুটি করতে হত। কাজেই বাবার সঙ্গে কবির পত্রালাপ বেড়ে গেল। সব পত্র রক্ষিত হয়নি। 'গোরা' আরম্ভ হয় এলাহাবাদে। বাবা অগ্রিম টাকা পাঠিয়ে কবিকে একটা লেখা দিতে বলেছিলেন।

কলকাতায় বাবা স্থায়ী বাসিন্দা হবার পর রবীন্দ্রনাথ আমাদের বাড়ী যাওয়া-আসা সুরু করেন। বাবাও প্রায়ই যেতেন। মুক্তারাম বাবুর স্ট্রিটের সরু গলি দিয়ে এই যাওয়া-আসা চলত। তখন কবির মোটর গাড়ী ছিল না। তিনি প্রায়ই হেঁটে চলে আসতেন। ফিরবার সময় একটা ঘোড়ার গাড়ী ডেকে দেওয়া হত। একদিন তিনি 'প্রবাসী'র সহকারী সম্পাদক চারুবাবুকে বললেন, "চারু, দেখত হে, একটা যানবাহন কিছু পাও কিনা।" চারুবাবু অনেক কষ্ট করেও একটা নীচু চাল দেওয়া থার্ড ক্লাস গাড়ী ছাড়া কিছু যোগাড় করতে পারলেন না। তাঁর লজ্জিত বিব্রত মুখের ভাব দেখে রবিবাবু বললেন, "কী আর হয়েছে? এ ত বিনয় শিক্ষার উৎকৃষ্ট উপায়।" এই বলে তিনি মাথা নীচু করে গাড়ীতে উঠে পড়লেন। এইরকম বিনয় শিক্ষা তাঁকে মাঝে মাঝে অন্য জায়গাতেও করতে হত। একবার তিনি মহলানবিশ মহাশয়ের বাড়ীতে একটা ছোট ঘরে ঢোকবার সময় মাথাটা নীচু করে তবে ঢুকতে চেষ্টা করলেন। মহলানবিশ মশায় বললেন, "আমি ত আর জানতাম না যে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্র কোন দিন আমার বাড়ীতে আসবেন। তাহলে দরজাগুলো আরও একটু উঁচু করতাম।" তিনি আশ্রমের ছাত্র বুলার অসুখ শুনে দেখতে এসেছিলেন।

এরপর রবীন্দ্রনাথকে কতবার দেখেছি, কিন্তু তা ডায়েরীর মত লিখে রাখিনি। সেকালে যখনই রামমোহন স্মৃতিসভা হত সিটি কলেজের পুরানো বাড়ীতে তখনই রবীন্দ্রনাথ আসতেন, এত লোক হত যে নীচের তলায় overflow meeting করতে হত। সেই সব সভায় কয়েকবার এক অতিবৃদ্ধ ভদ্রলোককে বলতে শুনতাম—তিনি রাজা রামমোহন রায়কে দেখেছিলেন। খুব দ্রুত "বাবু অথবা বাবুমশায়" বলে তাঁর বিষয় অনেক কথা বলে যেতেন, বোধহয় প্রতিবারই একই কথা, আজ তার ভাবার্থও মনে নেই।

রামমোহন লাইব্রেরী এবং পরে Madan প্রভৃতিতে বর্ষামঙ্গল হত, কয়েক বছরই দেখেছি, তার ফর্দ দিয়ে লাভ নেই। এইসব বিষয়ে অনেক মানুষই অনেক কথা লিখেছেন, পুনরুক্তি করা ছাড়া আমার দ্বারা আর কিছু হবে না। জোড়াসাঁকোর

'বিচিত্রা'র বাড়ীতে কবিকে যখন তুলাদানের জন্য তাঁর বইয়ের সঙ্গে ওজন করা হয়েছিল তখনকার কথা কেউ লিখেছেন কিনা জানি না। সেই সভাতে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত একটি সুন্দর কবিতা পড়েছিলেন। মনে আছে,

"চির নবীনতা শিশুশশী সম অঙ্কিত ভালে যাঁর।
সেই গৃহবাসী উদাসীজনের চরণে নমস্কার।"

কবির দিদিরা দুই-তিনজন সেখানে উপস্থিত ছিলেন, বোধহয় সৌদামিনী এবং শরৎসুন্দরী। তাঁদের উজ্জ্বল গৌরবর্ণ এবং লক্ষ্মীপ্রতিমার মত চেহারা দেখে মনে হল কুন্তলীনের এইচ. বসু বোধহয় এই সৌদামিনীকে দেখেই লিখেছিলেন :

"সৌদামিনী সরলার শ্রীকরকমলে
হতমান ল্যাভেণ্ডার, কাঁদে ম্যাকাসার।"

অবশ্য সৌদামিনী গুপ্ত সেকালে একজন নামকরা মহিলা ছিলেন। সরলা ছিলেন ডাক্তার পি. কে. রায়ের পত্নী।

মণিকা মহলানবিশের বাড়ীতে সমাজপাড়ায় এবং পরে পার্ক স্ট্রিটে রবীন্দ্রনাথ কখনও কিছু পাঠ করতে কখন বা শুধু নিমন্ত্রিত হয়ে আসতেন। আমারও নিমন্ত্রণ থাকত। একবার মহারাণী সুচারু দেবীও সেই সঙ্গে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। তিনি যদিও পোষাক-পরিচ্ছদে হিন্দু বিধবার মত ছিলেন, কিন্তু কথা বলতেন খুব হাসিয়ে হাসিয়ে। মণিকা দেবী আরও একটু গম্ভীর প্রকৃতির ছিলেন। মহারাণী আমার সঙ্গে এমন করে কথা বলতেন যেন আমি তাঁর সমবয়সী।

বোধহয় আমার বিবাহের কিছুদিন আগে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা মঞ্জুশ্রী ও ক্ষিতীশ চট্টোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। সেই বিবাহে রবীন্দ্রনাথ পৌরোহিত্য করেন। আমার বিবাহে রেজিস্ট্রি হবে না বলে বাবার ও নেপালবাবুর ইচ্ছা ছিল যে রবীন্দ্রনাথকে এই বিবাহেও পৌরোহিত্য করতে বলেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই কলকাতায় এসে বিবাহ দিতে রাজী হলেন না। বললেন, "শান্তার বিবাহ শান্তি-নিকেতনে দিন, তাহলে আমি পৌরোহিত্য করব।" কিন্তু আমার মা অসুস্থ ছিলেন বলে শান্তিনিকেতনে যাওয়া হল না। তারপর বোধহয় আমরা ক্ষুণ্ণ হয়েছি মনে করে একদিন আশীর্বাদ করবেন বলে আলিপুরে প্রশান্ত মহলানবিশের বাড়ীতে আমাদের ডেকে পাঠালেন। সেখানে দেখলাম পুরোপুরি বিবাহের আয়োজন। বরণ করারও ব্যবস্থা আছে। রবীন্দ্রনাথ আমাদের মুখোমুখি বসিয়ে বিবাহের মন্ত্রাদি সব পড়ালেন। বলতে গেলে লোক নিমন্ত্রণ করা ছাড়া আর প্রায় সব অনুষ্ঠানই হয়েছিল। এদিকে কলকাতায় আমার বিবাহের দিন স্থান ও পুরোহিত ঠিক করা

হয়ে গিয়েছিল। কাজেই নির্দিষ্ট দিনে আবার মন্ত্রাদি পড়িয়ে ডাঃ নীলরতন সরকার মহাশয় পৌরোহিত্য করে বিবাহ দিলেন। বিবাহের পৌরোহিত্য করা নীলরতন-বাবুর জীবনে বোধহয় এই প্রথম ও শেষ।

বিবাহের পর আমরা দীনেন্দ্র স্ট্রিটে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করে ছিলাম। তাকে অবশ্য ঠিক ফ্ল্যাট বলা যায় না—একতলায় একটা, দেড়তলায় একটা, তিনতলায় দুটো এবং চারতলার ঘর নিয়ে সেই ফ্ল্যাট ছিল। চারতলায় ঘর ছিল টালি দিয়ে ঢাকা। বাবা কিছুদিন আমার এই বাসাবাড়ীতে এসে ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "শান্তা কি নিজের বাবার চেয়ে একটু দূর সম্পর্কের কাউকে নিমন্ত্রণ করতে পারেন না?" কিন্তু বাড়ীটা এমনই অদ্ভুত ছিল যে তাঁকে নিমন্ত্রণ করার সাহস আমার হয়নি।

সেই সময় হিন্দু-মুসলমানে খুব দাঙ্গা চলছিল। বাবা রাস্তা দিয়ে রোজ হেঁটে দাদা ও অশোকদের দেখতে যেতেন, 'প্রবাসী' অফিসেও যেতেন। বাবার দাড়ি ছিল বলে সাধারণ লোকে কেউ কেউ বাবাকে মুসলমান মনে করত। তাই একজন বৃদ্ধা প্রায়ই বাবাকে সাবধান করে দেবার জন্য বলত, "বাবা, তুমি বুড়ো মানুষ, কোনদিন কার হাতে মারা পড়বে, অমন করে পথে বেরিও না।" বাবা অবশ্য রোজই বেরোতেন। আমিও মাকে দেখবার জন্যে রোজ বেরোতাম। সে সময় অশোক আর ডঃ নাগ দু-জনে দুটো বন্দুক কিনেছিলেন গুণ্ডাদের ভয়ে। আমি আশ্রমে থাকতে সন্তোষবাবুর কাছে বন্দুক ছোঁড়া শিখতে চেষ্টা করতাম কিন্তু পারতাম না। সুতরাং বন্দুক থেকেও আমার লাভ ছিল না। ডঃ নাগ আমারই মত আনাড়ী ছিলেন। দু-বাড়ীতে দুটো ভীষণ ধারালো এবং বড় কুড়োলও কেনা হয়েছিল। ভৃত্যরা সময় বুঝে তা চুরি করে নিয়ে পালিয়েছিল।

আমার বিবাহের কিছুদিন অর্থাৎ ৭।৮ মাস পরে অশোকের বিবাহ হল নীলরতনবাবুর ছোট মেয়ে কমলার সঙ্গে। বিবাহের সময় সীতা ছিলেন রেঙ্গুনে। তাই তাঁকে একটা চিঠিতে বিবাহের বর্ণনা দিয়েছিলাম। তার থেকে খানিকটা তুলে দিচ্ছি। আশা করি কিছু অশোভন হবে না।

"শনিবার ২৮শে নভেম্বর সকালবেলা মার খেয়াল হল যে ক্ষুদুকে আমার স্নান করিয়ে দিতে হবে এবং ওঁকে শাঁখ বাজাতে হবে। সকালবেলা সে সব একপালা হল, তারপর ক্ষুদুকে সন্দেশ লেবুর সরবৎ ও অন্যান্য ফল কিনে খাওয়ালাম। ও সেদিন ভাত ইত্যাদি খেল না। ওকে যেদিন আইবুড়ো ভাত দিয়েছিলাম, সেদিন তোমার দেওয়া ধুতি পরেছিল, বিয়ের দিন সকালে আমার দেওয়া ঢাকাই ধুতি পরল,

আমার hair lotion মাখল এবং আমার দেওয়া সন্দেশ খেল। দুপুরবেলা বৌঠান বাপের বাড়ী থেকে এ বাড়ী এলেন। তারপর আমরা একতলার ঘরে বরযাত্রীদের জায়গা করলাম। ফরাস এবং চেয়ার দুইরকমই ছিল। খাবারের মধ্যে খুব ভাল দুটো কেকও আনিয়েছিলাম, সেটা দেখতে দেখতে ফুরিয়ে গেল। বরযাত্রীরা বেশীরভাগই ক্ষুদুর বন্ধু। বড়দের মধ্যে ছিলেন অবনবাবু, গগনবাবু, সমরবাবু তিনভাই, আমার মামাশ্বশুরমশাই, পুলিনবিহারী দাস ইত্যাদি কয়েকজন। মেয়েরা খুবই কম।

রথী ঠাকুর মশায়ের গাড়ীটা বর পাঠানোর জন্য আনিয়ে রেখেছিলাম। সেটা চন্দ্রমল্লিকা ইত্যাদি ফুল দিয়ে অল্প একটু সাজানো হল। বরের গাড়ীতে নিতবররূপে হাবল (সান্যাল) বিকট একটা কালো কোট পরে বসল। খুকু অভিভাবিকা হয়ে সবুজ বেনারসী এবং এক গা গয়না পরে হাবলের কোলে বসলেন। ড্রাইভারের পাশে সজনী (দাস) ছিল। ক্ষুদুকে তার ভগ্নীপতি চন্দন পরিয়ে দিলেন।

মোটর, বাস, ট্যাক্সি ও প্রাইভেট গাড়ী ইত্যাদি নিয়ে রওনা হওয়া গেল। লাউডন স্ট্রিটের মোড়ে পৌঁছে দেখি, কনের বাড়ীর গাছপালাতে হাজার হাজার electric light জলছে। আমরা বর নিয়ে নামবা মাত্র মস্ত মস্ত তুবড়ি জালিয়ে দিল। পথঘাট যা সাজিয়েছিল ভীষণ। ওদের বাড়ীর সকলের বিয়ের চেয়ে এই ছোট মেয়ের বিয়েতেই বেশী ঘটা হয়েছিল।"

কনে তোলা বৌভাত ইত্যাদির বর্ণনা আর দিলাম না। বৌভাতের পর ক্ষুদুরা দার্জিলিং চলে গেল। বৌভাতে বাঁকুড়ার রাঁধুনিরা ভালো রান্না করেছিল, সবাই বিশেষত দিনু ঠাকুর খুব প্রশংসা করলেন।

এই বিবাহের কিছুদিন পরে League of Nations-এর পক্ষ থেকে অতুল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বাবাকে জেনিভা যাবার জন্য নিমন্ত্রণ করলেন। তখন বাবা আমার কাছে ছিলেন। বাবা ছিলেন নিরামিষাশী—পাছে ও দেশে অনাহারে থাকতে হয়, তাই আমরা তাঁকে রোজ ডিম খাওয়া অভ্যাস করাতাম। এলাহাবাদে থাকতে বাবাকে সাহেবরা নিমন্ত্রণ করলে তিনি প্রায়ই শুধু কড়াইসুঁটি সিদ্ধ আর আলুসিদ্ধ খেয়ে বাড়ী ফিরতেন। ইউরোপেও নিরামিষ রান্না lard দিয়ে করত বলে তিনি খেতে পারতেন না। তাঁর যৌবনকালে যখন তিনি মাছ খাওয়া ছেড়ে দেন, তখন আমার ঠাকুরমা মাছের ঝোল থেকে মাছটা তুলে নিয়ে বাবাকে খেতে দিতেন। যাতে একটু পুষ্টি যেন তাঁর হয়। বাবা বুঝতে পারতেন কিন্তু তাঁর মা দুঃখ পাবেন বলে কিছু বলতেন না। এলাহাবাদে আমরা যখন ছিলাম তখন মাছ প্রায় পাওয়াই যেত না। কাজেই আমরা সকলেই প্রায় নিরামিষ খেতাম। মাছ পেলে আমরা অবশ্য

বাবাকে বাদ দিয়ে আর সবাই খেতাম। ইলিশ মাছের সময় ওখানে খুব বড় বড় ডিম ভরা ইলিশ পাওয়া যেত। বিদেশ থেকে আগত আমাদের বাড়ীর অতিথিরা অনেক সময় ইলিশ মাছ কিনে ডিমগুলি কেটে আমাদের দিয়ে মাছগুলি বাড়ী নিয়ে যেতেন। অপূর্বচন্দ্র দত্ত মহাশয় এটা খুব ভালবাসতেন।

বাবা জেনিভা থেকে খুব অসুস্থ হয়ে ফিরে আসেন। সেখানে ট্রেনে হিটিং বন্ধ করে দেওয়ায় ঠাণ্ডা লেগে তাঁর নিউমোনিয়ার মত হয়েছিল। এই সময় ডাঃ রজনী-কান্ত দাস ও তাঁর ইউরোপীয় পত্নী সোনিয়া বাবার খুব সেবাযত্ন করেছিলেন। ইউরোপীয় নার্স যে সব কাজ করতে চাইত না, সোনিয়া স্বয়ং তা করে দিতেন। সোনিয়া চিরদিনই বাবাকে খুব ভক্তি করতেন। তিনি বলতেন, "Ramananda Babu, you are India to us." রজনীবাবু পরে কিছুদিন শান্তিনিকেতনে কাজ করেছিলেন। বাবাও তখন শান্তিনিকেতনে।

বহু বৎসর পরে আমরা যখন তিন কন্যা নিয়ে জেনিভা হয়ে আমেরিকা যাই তখন জেনিভার একটা হোটেলে হঠাৎ সোনিয়া ও রজনীবাবুকে দেখি। তাঁরা আমাদের অকস্মাৎ দেখে খুব খুশি হন। League of Nations-এর বাড়ী ঘুরে ঘুরে দেখান। জেনিভার লেকের ধারে বসে আইসক্রীম খাওয়ান। সোনিয়া মেয়েদের বললেন, "আমেরিকা গিয়ে কখ্খনো ইউরোপীয় পোষাক প'রো না, ওরা নিগ্রো বলবে।"

আবার পুরাতন কথা মনে পড়ছে। বিবাহের পর জীবনের পথে আর একটা মোড় ফিরে গেলাম। নূতন কত মানুষ কাছে এল পুরাতন অনেকে দূরে পড়ে রইল। স্কুল কলেজের যে সব বন্ধু এত প্রিয় ছিল, জীবনে তাদের অনেককে আর দেখিইনি। এ যে আর একটা নূতন জীবন। নানা নূতন ধরনের দুঃখ ও সুখ জীবনকে ঘিরে ধরতে লাগল। সুখের বিষয় বাবা যতদিন জীবিত ছিলেন বাবার সঙ্গে যোগ কখনও ছিন্ন হয়নি। বাবা কলকাতায় ও ঘাটশিলায় আমার বাড়ীতে আমার কাছে কতবার থেকেছেন। নানারকম অসুবিধা হলেও বাবা গ্রাহ্য করতেন না। কলকাতায় চারতলায় থাকা পর্যন্ত অনায়াসে অভ্যাস করে নিয়েছিলেন। লোকের সঙ্গে দেখা করতে হলে প্রতিবারই নিচে নেমে আসতেন। কিন্তু আমি কাছে ছিলাম বলে বাবা আনন্দেই ছিলেন।

ঘাটশিলা তিনি বিশেষ করে ভালবাসতেন। তাছাড়া সেখানে গেলে তাঁর দুই মেয়ে ও পাঁচ দৌহিত্রদের কাছে পেতেন। সেটাও তাঁর একটা আনন্দ ছিল। যেদিন ঘাটশিলা ছেড়ে কলকাতায় ফিরতেন, সেদিন বাবার মন এত খারাপ হত যে তিনি

বাড়ী থেকে বেরিয়ে আর আমাদের দিকে ফিরে তাকাতেন না। পিছন ফিরেই গাড়ীতে উঠে যেতেন। আমাদের বোধহয় তখনকার মত ভুলে যেতে চাইতেন।

ছেলেবেলা আমাদের স্কুলে রেখে আসতে বাবার যেরকম মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল, অনেক বয়সেও আমাদের ছেড়ে যেতে তাঁর সেইরকমই খারাপ লাগত মনে হয়। যখন আমি অন্য বাড়ীতে থাকতাম বাবা ওয়েলেস্‌লি ষ্ট্রিট অথবা পার্ক ষ্ট্রিট থেকে হেঁটে পার্ক সার্কাস পর্যন্ত এসে প্রায়ই আমাদের দেখে যেতেন। সীতা বহুদিন রেঙ্গুনে ছিল, সেটা বাবার খুবই কষ্টের কারণ ছিল। নিজের নাম করে কখন কিছু বলতেন না। কিন্তু যদি আমাদের কখনও বিদেশে যাবার কথা হত, বাবা বলতেন, "যতদিন তোমার মা আছেন কলকাতার বাইরে চলে যেও না।" সেইজন্য বাইরে ভাল কাজের সম্ভাবনা থাকলেও ডাঃ নাগকে আমি বাইরে যেতে বারণ করতাম। একলা অবশ্য তিনি বহুবার বিদেশে যেতেন, কিন্তু আমি মা থাকতে কোথাও যাইনি। মা চলে যাবার পর আমি জাপান গিয়েছিলাম। ফেরবার সময় আমার সঙ্গী ছিল মাত্র আমার দশ বছরের মেয়ে।

জীবনের পথে চলতে চলতে যাত্রাপথের যে সব সুর মনে বেজেছিল তারই কিছু কিছু প্রতিধ্বনি এই পাতাগুলিতে ধ্বনিত হয়েছে। অনেক আনন্দ ও গভীর বেদনার সুর দশজনের কানের জন্য নয়, তা যার মনে বেজেছিল শুধু তারই জন্য রইল, তবু, অনেক সুর ও ছবি নানা দিকে ভেসে উঠে আবার মিলিয়ে যায়। সব ধরা দেয় না। তাছাড়া প্রথম জীবনের কথা মানুষের কাছে সদ্যফোটা ফুলের মত প্রাণবন্ত থাকে, পরে আর সেরূপ থাকবে না। ভ্রমণ অনেক লিখেছি, ঘুরেওছি বহু দেশে দেশে, কিন্তু সে সবই অন্যরকম জিনিষ, যেন পূর্বজন্মে সবই দেখেছিলাম। প্রথম জীবনে সবই নূতন চোখে দেখতাম।